করিতেছেন। তিনি স্বয়ং আসামের চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মেয়েদের জন্য একটী ইংরাজী স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট মহিলাসমিতির কার্য্য-বিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারায় উক্ত সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার সুবিধা হইল না। যাহাহউক, এই সকল মহিলা-সমিতি এবং তাহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আশা হইতেছে, শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে আমাদের হিন্দুরমণীগণই পুরুষদিগের পশ্চাতে থাকিয়া দেশের জন্য খাটিতে এবং দেশকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ মিলিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোম্বাইয়ে শ্রীমতী রাণাডে সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতিনী হইয়াছেন। দেরাদুনে কোরা দেবী ও কেশরী দেবী যে কন্যা-পাঠশালা কার্য্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ।

নারদ সনৎকুমারের নিকট সমাগত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা এই নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহারা অধিকারি-ভেদে তাঁহাদের শিক্ষার ইতর বিশেষ করিতেন। যদি একবারে একজন অনভিজ্ঞ শিষ্যকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়, সে তাহা ধারণা করিতে পারে না। সেইজন্য অল্পে অল্পে সোপান-পরম্পরাক্রমে তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারদ ঋষি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ আছে তিনি বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু এরূপ ভক্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব লাভ করেন নাই, আখ্যায়িকাতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। বোধ হয় নারদ ঋষির নাম কেবল উপমা-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহাহউক পূর্ব্ব-কালীন প্রথা ছিল, গুরু পরমার্থতত্ত্বের উপদেশ দিবার পূর্ব্বে নিকৃষ্টাধিকারীর সহজ বোধার্থ কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিতেন।

নারদ ঋষি যখন শিক্ষার্থী হইয়া সনৎ-কুমার মহর্ষির নিকট সমাগত হইলেন, মহর্ষি তাঁহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন?" নারদ তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি বেদচতুষ্টয়, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, রাশিগণিত, পদার্থতত্ত্ব, নিধিশাস্ত্র, অর্থাৎ

কালগণিত, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা অর্থাৎ নিরুক্ত নামক বেদের অভিধানগ্রন্থ, বেদাঙ্গ সকল অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প ও ছন্দ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা—ঔষধাদি, নৃত্যগীতবাদ্য, শিল্প, চিত্র এবং কারুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি কেবল শাস্ত্রবিৎ—আত্মবিৎ নহেন। অতএব সনৎকুমারের নিকট আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছি। আমি শুনিয়াছি ভবাদৃশ মহাত্মাদের কৃপাতে লোকে শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, অতএব আমাকে শোকসাগরের পরপারে লইয়া যাউন।

সনৎকুমার নারদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন "আপনি কেবল শাস্ত্রমাত্র শিখিয়াছেন। নাম শিক্ষা যে প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল নাম বা শাস্ত্রদ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। যাহারা নামব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা শাস্ত্রমধ্যে তাঁহার অনেক তত্ত্ব জানিতে পারে। কিন্তু নাম অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব আছে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। সনৎকুমার বলিলেন—নাম অপেক্ষা বাক্য শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বাক্যই শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বাক্য অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মন দ্বারা বাক্য পরিচালিত হয়। মন অপেক্ষা সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সঙ্কল্প না থাকিলে মন নিজ বিষয়ে ধাবিত হয় না। সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু চিত্ত সঙ্কল্পের মূল, চিত্ত প্রয়োজনাদি নিরূপণ করে। চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু ধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

পরে মহর্ষি যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা চিত্তাদি স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম হয়, তাহাদের উল্লেখ করিলেন, যথা—অন্ন, জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু। ইহারা না থাকিলে প্রাণ থাকে না এবং প্রাণ না থাকিলে সমস্তই বিফল হয়। এই বলিয়া প্রাণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন :—

একদা ভূত সকল এবং প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব প্রাধান্য লইয়া বিবাদারম্ভ করায় প্রাণ বলিলেন, "আমি উৎক্রান্ত হইলে তোমরা কেহই স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পার না।" অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের বাক্য উপেক্ষা করায় প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ মৃতপ্রায় হইয়া প্রাণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। যেমন মৃণাল সকল নালমধ্যগত সূত্রদ্বারা সংযুক্ত থাকে, এবং মণি সকল সূত্রদ্বারা গ্রথিত থাকে, সেইরূপ প্রাণেতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। যেমন চক্রনাভিতে অর সকল সমর্পিত থাকে, সেইরূপ প্রাণে সকল সমর্পিত; প্রাণ সকলের জীবন রক্ষা করে। প্রাণ পিতা, প্রাণ মাতা, প্রাণ স্বসা, প্রাণ গুরু,

এবং প্রাণ ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে অযুক্ত বাক্য বলে, বিবেকী পুরুষেরা তাহাকে ধিক্কার দেন। সে পিতৃহা, মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বস্বহা, আচার্য্যহা, ব্রাহ্মণহা, বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তিনি প্রাণোপাসক হয়েন।

মহর্ষি সনৎকুমার দেখিলেন যে, নারদ প্রাণোপাসক, কিন্তু ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে আরও কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন যে, প্রাণোপাসক প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক নহেন। কিন্তু যিনি নিরতিশয় ভূমাখ্য সত্যকে জানেন, তিনিই পরমতত্ত্ব লাভ করেন। নারদ সনৎকুমারের নিকট সেই সত্য বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্! আমাকে সত্য শিক্ষা দিন।" সনৎকুমার বলিলেন যে বিজ্ঞান ব্যতীত সত্যস্বরূপকে জানিতে পারা যায় না। ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে হইলে মননের প্রয়োজন। আত্মাকে দর্শন করিতে হয়, শ্রবণ করিতে হয়, মনন করিতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে হয়। অতএব তুমি তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিয়া মনন কর। মননের জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজন। যে শ্রদ্ধান্বিত নহে, সে মনন করিতে পারে না। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞানলাভ করিতে পারে। আস্তিক্য বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা বলে। পরমাত্মা-সত্তায় বিশ্বাস জ্ঞানের মূলীভূত কারণ। শ্রদ্ধার মূল গুরূপদেশে নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধাও থাকে না। অতএব নিষ্ঠাবান্ হও।

নারদ—কি প্রকারে নিষ্ঠাবান্ হওয়া যায়?

সনৎকুমার—চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা নিষ্ঠাবান্ হওয়া যায়।

নারদ—চিত্ত একাগ্র করিবার উপায় কি?

সনৎকুমার—ঐহিক সুখের জন্য আমরা লালায়িত হইয়া যখন তৎপ্রতি ধাবিত হই, তখন দেখা যায় চিত্ত একাগ্র না হইলে সেই ক্ষুদ্র সুখও লব্ধ হয় না। কিন্তু যখন চিত্ত একাগ্র হয়, তখন সুখও লাভ হয়। সুখের আশাতেই লোক মনকে একাগ্র করে। অতএব তুমি সুখ অন্বেষণ কর।

নারদ—সুখ কি?

সনৎকুমার—যাহা ভূমা, অসীম, নিরতিশয় মহান্, তাহাই সুখ; ক্ষুদ্র পরিমিত পদার্থে সুখ নাই।

নারদ—ভূমা কি?

সনৎকুমার—যাঁহাকে দেখিলে আর দ্রষ্টব্য থাকে না, যাঁহাকে শ্রবণ করিলে অন্য শ্রোতব্য থাকে না, যাঁহাকে জানিলে অন্য জ্ঞাতব্য থাকে না, তিনি ভূমা। আর যাহার দর্শন শ্রবণ ও জ্ঞান হইলে অন্য দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা ক্ষুদ্র। সেই ভূমাকে জানিলে তাহাতেই সকল জানা হয়, আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। সকলই সেই ভূমাতে অন্তর্নিহিত। আর যাহা ভূমা, তাহা অমৃত; ক্ষুদ্র বস্তু মৃত্যুর অধীন।

নারদ—সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ?

সনৎকুমার—সেই ভূমা আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক ভাবে মহিমাতেও তিনি নাই বলা যাইতে পারে।

নারদ—(সংশয়াকুলচিত্তে) মহিমাতে যাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত বলা হইল, তিনি অপ্রতিষ্ঠ কি প্রকারে হইতে পারেন ?

সনৎকুমার—গো, অশ্ব প্রভৃতিকে লোকে মহিমা বলে, হস্তী হিরণ্য, দাস ভার্য্যা ও বিস্তৃত ক্ষেত্রকেও লোকে মহিমা বলে, আমি সে মহিমার কথা বলি নাই। যাহারা অন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধেই আমি এ মহিমা বলিয়াছি। সেই ভূমা স্বীয় মহিমাকেও আশ্রয় করিয়া থাকেন না।

নারদ—এই ভূমা সম্বন্ধে আরও জানিতে চাই, বলুন।

সনৎকুমার—সেই ভূমা দেশ বা কালে আবদ্ধ নহেন। তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি অধতে, তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি বামে, তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। যিনি এই প্রকারে আত্মদর্শন করেন, আত্মশ্রবণ করেন, আত্ম মনন ও বিজ্ঞান করেন, তিনি আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে পঞ্চভূত, আত্মা হইতে সকলের আবির্ভাব তিরোভাব, আত্মা হইতে অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্ম ইতাদি উৎপন্ন হয়, জানেন। যিনি এইরূপে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমর হয়েন।

সনৎকুমারের উপদেশে নারদ ঋষি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেন।

আমার কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——সহরে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়া আমি স্থানীয় লোকের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রৌঢ় ব্যক্তিরা আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, যুবকেরা শ্রদ্ধা করিতেন ; এবং স্কুল কলেজের ছেলেরা আমার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা অম্লান-বদনে বলিয়া বেড়াইত কালে আমি কেশব চন্দ্রের তুল্য অদ্বিতীয় বক্তা হইব। ছেলেদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকিলেও তাহাদের ভালবাসায় আমার বিশ্বাস ছিল। আমি পশ্চিম বঙ্গের লোক হইলেও পূর্ব্ব বঙ্গের এই বৃহৎ সহরটিতে বেশ তৃপ্তির সহিতই কার্য্য করিতে লাগিলাম।

কিন্তু অকস্মাৎ ঝড়ের ন্যায় একটা ঘটনা আসিয়া আমাদের শান্তিপূর্ণ সহরটিতে অশান্তির আন্দোলন তুলিয়া দিল ! কলিকাতা হইতে একটা থিয়ে-

টারের দল আসিয়া আমাদের সহরে অভিনয় আরম্ভ করিল। এ সহরের অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বে কখনও থিয়েটার দেখেন নাই। থিয়েটারের জাঁকাল বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য থিয়েটার দেখিতে যাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একদিন "সুনীতিসঞ্চারিণী" সভার সভাপতি মহাশয় আসিয়া আমাকে বলিলেন "স্কুল কলেজের ছেলেগুলি যে রোজই রাত জাগিয়া থিয়েটার দেখে, তাহাদের পড়া শুনা সবইত মাটি হইবে।"

আমি। শুধু কি পড়া শুনাই মাটি হইবে? দেখুন না কতগুলা ছেলের চরিত্র খারাপ হইয়া যায়।

সভাপতি—তবে ত বড় ভয়ের কথা। অন্ততঃ স্কুল কলেজের ছেলেগুলি যাহাতে থিয়েটার দেখিতে না যায়, তাহার একটা চেষ্টা করা উচিত। আসুন না, এজন্য আমরা একটা সভা করি।

আমি। তা করুন; আমাকে কি করিতে হইবে?

সভাপতি। আপনাকে খুব ভাবের সহিত একটি বক্তৃতা করিতে হইবে। বক্তৃতা শুনিয়া যেন ছেলেরা বুঝিতে পারে থিয়েটারের নেশাটা তাহাদের পক্ষে ভাল নয়।

আমি রাজি হইলাম। সভাপতি মহাশয় গৃহে গমন করিলেন। তাহার পর যথার্থই এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। স্কুল কলেজের ছেলেরাত আসিলই। তা ছাড়া সভার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য থিয়েটার-ওয়ালারা দল বাঁধিয়া আসিল—এমন কি তাহাদের অনেক অভিনেত্রী পুরুষের ছদ্মবেশে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আমি আমার হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবে প্রমত্ত হইয়া এমন তেজের সহিত বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম যে, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় এক অভিনব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরা এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তখন সেই সভাস্থলে আমার বিরুদ্ধে কেহ একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেও তাহার রক্ষা থাকিত না।

আমার বক্তৃতার পর শত শত স্কুল ও কলেজের ছাত্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে, তাহারা প্রাণান্তেও থিয়েটার দেখিতে যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি আমার বক্তৃতায় আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্য হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরিলাম। কিন্তু মনের উত্তেজনায় সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হইল না। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া সহরের প্রান্তস্থিত একটি উদ্যানে গমন করিলাম। এই উদ্যানে যদিও একটি রমণীয় অট্টালিকা ছিল, তথাপি একজন মালী ভিন্ন কেহই সে বাগানে বাস করিত না। স্থানটি অতিশয় মনোরম ও নির্জ্জন বলিয়া আমি প্রায়ই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এখানে

আসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইতাম। আজ প্রায় পনর দিন হইল কাজের ঝঞ্ঝাটে এখানে আসিতে পারি নাই।

পনর দিন পরে উদ্যানে আসিয়া দেখিলাম নব-ঋতু-সমাগমে উদ্যানটি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লতাকুঞ্জে পুষ্পিত লতিকাচয় ঈষৎ বায়ু-হিল্লোলে দুলিতেছে, শিশিরসিক্ত পুষ্পরাজি যেন উৎফুল্লনয়নে উষার রক্তিম রশ্মিলীলা দর্শন করিতেছে। এখনও তরুশাখায় পুষ্পমঞ্জরীসকল অরুণের তরুণ কিরণ-ছটায় ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমি বরাবরই পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থিত একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপর আমার একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া বসি, এবং কিয়ৎকাল পরে ধ্যানস্থ হই। আজিও সেই বেদীর অভিমুখে চলিলাম। কিন্তু বেদীর কাছে যাইতে না যাইতেই সহসা নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত করুণ স্বর-লহরীতে কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমি বিস্মিত হইয়া বেদীর কাছে গিয়া দেখি, একুশ বাইশ বৎসরের এক সুন্দরী তরুণী অশ্রু-জলে সিক্ত হইয়া বিষাদ-সঙ্গীতে আজিকার এই আনন্দোজ্জ্বল মধুর উষাকালটিকেও বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে। রমণীর নীলোৎপল নয়নদ্বয়ে তাহার অন্তরের সমস্ত জ্বালা যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কে এ রমণী? কেন এই উদ্যানে আসিয়াছে? কোন্ অভিমানে অথবা কোন্ যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছে? রমণীর মুখশ্রী দেখিবামাত্র মনে হয়, কোন নব্য শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের বুদ্ধিমতী কন্যা অথবা বধূ। হায়! এই নির্জ্জন রোদন ভিন্ন অসীম বিশ্বসংসারে দুঃখিনীর জুড়াইবার কি কোনও উপায় নাই?

আমি কয়েকটি পুষ্পবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমণীকে দেখিতেছিলাম, তাই রমণী আমাকে দেখিতে পাইল না। তবুও সে জায়গায় আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত বোধ হইল না। আমার মনে হইল হয়ত যাঁহার এই উদ্যান, তিনিই সপরিবারে উদ্যানে বাস করিতেছেন। তাঁহারই পরিবারের কোনও দুর্ভাগিনী রমণী মর্ম্মান্তিক জ্বালায় অধীর হইয়া অন্তর্যামী দেবতার নিকট গোপন মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

আমি উদ্যানের ফটকের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিবামাত্র মালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মালী আমাকে অতি প্রত্যূষে এই উদ্যানের ভিতর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতে দেখিয়া মনে করিত আমি একজন সাধক বা সিদ্ধপুরুষ। তাই আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। আজ আমাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবু, এখন দেখিতেছি আপনার বাগানে আসিয়া পূজা করা মুস্কিল হইবে। কলি-কাতার থিয়েটারের বাবুরা আমার মনিবের হুকুম লইয়া এখানে বাসা করিয়াছে।"

"থিয়েটারের বাবুরা" শুনিয়া আমি

একেবারে চম্‌কে উঠিলাম। হয়ত তাহারা রাত্রিকালে অভিনয় করিয়া এই প্রভাত-কালেও নিদ্রা যাইতেছে। নহিলে তাহারা যদি আমাকে দেখিতে পাইত, তবে নিশ্চয়ই আমার আর বিপদের সীমা থাকিত না।

কিন্তু যে বিষাদময়ী রমণীর করুণ সঙ্গীত শুনিলাম, সে কি থিয়েটারেরই একজন অভিনেত্রী? তাহাই হইবে। নহিলে কোনও ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে কি এই ভোর বেলা নির্জ্জনে বসিয়া মুক্ত-কণ্ঠে গান গাহিতে পারে?

আমি তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ আর কোনও কাজ কর্ম্মেই মন বসিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া শুধুই সেই সজলনয়না সঙ্গীতকারিণীর ম্লান মূর্ত্তি আমার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এই দুর্ভাগিনী কলঙ্কিনী তীব্র সুখের উন্মাদকর মোহে পড়িয়াই হয়ত অস্ফুট জীবন-কলিকা স্বহস্তে বৃন্তচ্যুত করিয়া পৃথিবীর পাপপঙ্কিল মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। এখন হয়ত এই থিয়েটার-ওয়ালাদেরই কোনও দুর্ব্যবহারে দারুণ বেদনা পাইয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য হাহাকার করিতেছে। হায়, বিধাতার বিশ্বরাজ্যে একি নির্ম্মম দৃশ্য! কেন কুসুমে কীট? অমৃতে গরল? বিধাতা স্বহস্তে যদি এমন পুষ্পপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন, কণ্ঠে অমৃতধারা ঢালিয়া দিলেন, তবে এ প্রতিমা পৃথিবীর কলঙ্কে মলিন হইল কেন? কবে এই ধরণী হইতে মলিনতা চলিয়া যাইবে? কবে সংসার পবিত্র—সুখের সংসার হইবে?

সহসা ডাক পিয়ন চিঠি লইয়া উপস্থিত হইল। আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ প্রশমিত হইল। আমি খবরের কাগজের সংবাদগুলি পড়িয়া একখানি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধগুলির উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলাম। একটী প্রবন্ধে "আলো ও ছায়া"র বিরুদ্ধে কতকগুলি অযথা অভিযোগ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম। ভাবিলাম আজ বিকালেই ইহার একটী প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিকাল বেলায় "আলো ও ছায়া"র সপক্ষে কিছু লিখিবার জন্য উক্ত গ্রন্থখানি বাহির করিলাম। কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বপ্রথমেই "চাহিবে না ফিরে?" শীর্ষক উৎকৃষ্ট কবিতাটি আমার চক্ষে পড়িল। আমি দুইটি শ্লোক অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম। একটি—

"পতিত মানব তরে　নাহি কিগো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার?"

অন্যটি:—

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল একসাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,

তোমরা কি দয়া করে, তুলিবে না হাতে ধরে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই ?"

এই কয়েক পংক্তি কবিতায় পতিত মানবের প্রতি কবির করুণ হৃদয়ের সহানুভূতি যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের সহস্র লোক যাহাদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করে, সেই ঘৃণিতদিগের প্রতি যিনি করুণা প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার চেয়ে আবার মহৎ কে? কিন্তু আমাদের সমাজে পতিত পুরুষদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার জন্য পিতা আছে, মাতা আছে, ভাই আছে, বন্ধু আছে, অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা আছেন; পতিতা নারীদিগের প্রতি একবিন্দু দয়া প্রকাশ করিবার জন্য কেহই নাই— অথচ সংসারে পতিতা নারীদিগের ন্যায় কৃপার পাত্রী অতি অল্পই আছে।

ইহা যখন ভাবিতেছিলাম, তখন আবার বিকালের ডাকের চিঠি লইয়া ডাক পিয়ন বাহির হইল। আমার এক খানা মাত্র চিঠি ছিল। আমি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম :—

"মহাশয়, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন পাপিষ্ঠ যুবক। সম্প্রতি এই সহরে আসিয়াছি। কিছুদিন হইতেই আমার দুষ্কৃতির জন্য আমি নিদারুণ অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অথচ প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন সুযোগ না থাকায়, অনবরত পাপের পথেই চলিতেছি। কিন্তু কাল রাত্রে আপনার বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি সাধু পুরুষ। আপনার করুণা আকর্ষণ করিতে পারিলে আমার উদ্ধারের আশা আছে। তবে আমি চতুর্দ্দিকের প্রলোভনদ্বারা এরূপ বেষ্টিত যে, প্রকাশ্য ভাবে আপনার সম্মুখে যাইবারও আমার শক্তি নাই। তাই আজ রাত্রি দুটার সময় ছদ্মবেশে আপনার বাটীর দ্বারদেশে উপনীত হইব। আপনি যদি দয়া করিয়া কিয়ৎকালের জন্যও আপনার নিকটে একটু স্থান দান করেন, এবং আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করেন, ভরসা করি তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার হইবে।"

চিঠিখানি কোথা হইতে আসিয়াছে, কে লিখিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল হয়ত অসৎ লোকেরা তাহাদের কোনও দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। আবার ভাবিলাম যদি কোন বিপথগামী যুবকেরই মন ফিরিয়া থাকে।

যাহো'ক, আমার অনুগত দুই জন অসুরের মত পালোয়ান যুবককে ডাকিয়া বলিলাম, "আজকাল হয়ত অনেক লোক আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের এ সহরে গুণ্ডার ত আর অভাব নাই। দিন কয়েক রাত্রে তোমরা আমার পাশের ঘরে শুইয়া থাক।"

তাহারা হাসিয়া কহিল "কার ঘাড়ে কয়টা মাথা, যে আমরা থাকিতে আপনার

এক গাছি কেশ কেহ স্পর্শ করে? আচ্ছা, আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আজ রাত্রেই আসিয়া আপনার পাশের ঘরে শুইব।”

সমস্ত রাত্রি আর আমার ঘুম হইল না। ঘড়িতে দুইটা বাজিবার পূর্ব্বেই গেটের কাছে গিয়া একটি আলো হাতে লইয়া দাঁড়াইলাম। ঠিক্ দুটার সময়ই দীর্ঘকেশ, গৌরবর্ণ, সুন্দরমুখশ্রী একটি বালক আসিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম “তুমিই কি আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে?”

বালকটি মুখ নীচু করিয়া লজ্জা-বিনম্র-ম্লানভাবে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ।” আমি দ্বার খুলিয়া তাহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিলাম এবং আমার বিছানার এক পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। বালক বিছানার উপরে না বসিয়া বিছানার নীচে ঘরের মেজের উপরেই বসিয়া পড়িল। বালকের মিষ্ট মুখখানি যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বলিতে কি, সেই সুন্দর মুখখানি দেখিয়া আমার মনে এমন একটি মমতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, বালক আমার কাছে গুরুতর অপরাধী হইলেও আমি তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া ছোট ভাইটির মত স্নেহ ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম।

কিছুক্ষণ বালকের কণ্ঠ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। তারপর কাতর করুণস্বরে কহিতে লাগিল, “আমি এই অনুতাপের সময়েও আপনার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছি। আমি পাপিষ্ঠ যুবক নই, আমি পাপিষ্ঠা নারী!”

আমি। তবে কি তুমি থিয়েটারেরই একজন অভিনেত্রী? আজ প্রত্যূষে তুমিই কি উদ্যানে বসিয়া বিষাদ-সঙ্গীতে কানন পূর্ণ করিতেছিলে?

রমণী। আমিই সেই দুর্ভাগিনী; থিয়েটারেরই অভিনেত্রী।

থিয়েটারেরই অভিনেত্রী! তবে এই গভীর নিশীথকালে আমি একাকী এক-জন কলঙ্কিনী রমণীর সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছি! শরীর রোমাঞ্চিত হইল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী অভিনেত্রী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। আমাকে কহিল, “আমি পতিতা রমণী বলিয়া আপনি ভয় পাইবেন না। আমি অধিকক্ষণ আপনার কাছে থাকিব না। শুধু একবার আমার দুঃখের কাহিনী আপনাকে শুনাইব। আপনি যদি আমাকে আমার পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা যতই কঠোর হোক না কেন, আমার এই পাপ শরীর ভাঙ্গিয়া গেলেও সে উপায় অব-লম্বন করিব।”

কে বলিবে এই পতিতা রমণী কি কুহকে আমার হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছিল। আমি স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম “নিঃসঙ্কোচে তোমার সমস্ত কাহিনী বলিয়া যাও।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভিনেত্রী কহিল, “আমি হুগলী

জেলার একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার পিতা চন্দ্রকুমার বাবু শিক্ষিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি হইলেও নিতান্ত প্রাচীনভাবাপন্ন ছিলেন। তাই আমার অষ্টম বৎসর বয়সের সময়েই হুগলীর এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যবসায়ী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। আমার শ্বশুর ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও আমার স্বামী কলেজে পড়িতেন। তাঁহার বয়সও ষোল বৎসর হইয়াছিল। অনুমান করি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসও ছ চারখানা তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে আমাকে ভাল বাসিতে —আমাকে লেখা পড়া শিখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"

আমার চোখে মুখে কেমন এক অ-স্বাভাবিক উত্তেজনা এবং উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অভিনেত্রী তাহা লক্ষ্য করিল। তাই বলিয়া উঠিল,—

"আমি কাল পুরুষের ছদ্মবেশে বক্তৃতা শুনিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছি, ও শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি আপনি দেবতা, আপনার পুণ্যের শরীর। আপনার কাছে করযোড়ে বলি, আমাকে ঘৃণা করুন, কিন্তু অবিশ্বাস করিবেন না। আমাদ্বারা আপনার কোনও অনিষ্ট হইবে না। আমি সংক্ষেপেই আমার কথা বলিতেছি।"

"আমি আমার বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান; শৈশবকাল হইতেই তাঁহাদের স্নেহবক্ষে প্রতিপালিত হইয়াছি। তাই বিবাহের পর যখন বৃক্ষচ্যুত লতার ন্যায় পিতা মাতার স্নেহবিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বশুর-গৃহে আসিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। শ্বশুরের স্নেহ, শাশুড়ীর যত্ন, কিছুতেই আমি সান্ত্বনা পাইলাম না। আমি বৃহৎ অবগুণ্ঠনে আমার ক্ষুদ্র দেহ আবৃত করিয়া শুধুই কাঁদিতে লাগিলাম।"

"তখন কে আমার পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, আমার সখীদের বাল্যপ্রণয় একটী হৃদয়ে সমাবেশ করিয়া অভিনব মনো-মোহন মূর্ত্তিতে এই স্নেহকাতর বালিকার ব্যথিত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করিল? কে সেই বালিকা-হৃদয়ে প্রীতি সুধা ঢালিয়া দিয়া সমগ্র হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া লইল? সে আমার স্বামী। আমার বেদনা আমার স্বামীর কোমল হৃদয়ে যখন বড়ই বাজিল, তখন তিনি আমাকে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া, গল্প শুনাইয়া, ছবির বই দেখাইয়া কয়েক দিনের ভিতরেই বশ করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি আমাকে পড়াইতে লাগি-লেন, হারমনিয়ম বাজনা শিখাইতে লাগিলেন।"

"শেষকালে এমন হইল যে, আমাদের দেখিলে লোকেরা দুটী ভাইবোন বলিয়া মনে করিত। আমাদের এইরূপ ব্যবহারে আমার শ্বশুর শাশুড়ী বাধা দিতেন না, বরং তাঁহারা ইহাতে আমোদ পাইতেন। এক এক দিন এমন হইত যে, আমার স্বামী আমোদ করিবার জন্য আমাকে

রাগাইতেন, আমি গিয়া আমার শাশুড়ীর কাছে কান্না আরম্ভ করিতাম। আমার শাশুড়ী আমাকে বুকে নিয়া আদর করিয়া আমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেন,

"রমেশ তোমাকে রাগাচ্ছিল? আচ্ছা, আমি তাকে গালাগালি দিব।"

"রমেশ" নাম শুনিয়া আমি আরও অস্থির হইলাম। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার অভিনেত্রীর কথা শুনিতে লাগিলাম। অভিনেত্রী বলিতে লাগিল :—

"এইরূপ আনন্দে যখন দুই বৎসর কাটিয়া গেল, আমার বয়স দশ বৎসর হইল, তখন একবার আমার বাপ মায়ের সঙ্গে কাশী গেলাম। তখন কাশীতে যাত্রীর অত্যন্ত ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই একদিন রাত্রে আমার মা আমাকে লইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। আমার মা বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া এমন আত্মহারা হইলেন যে, আমার প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না। আমাদের চাকরগুলি মন্দিরের বাহিরে ছিল। এই সময় একদল লোক ভিড় করিয়া, আমাকে ঠেলিয়া আমার মায়ের নিকট হইতে অনেক দূরে লইয়া গেল। আমার মা তখন কি করিলেন, তাহা জানিবারও সুযোগ রহিল না। আমাকে জন কয়েক লোক যে কি ভাবে কোথায় লইয়া গেল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক দিন একটা নির্জ্জন ঘরে পড়িয়াই কাঁদিতে লাগিলাম। তারপর সেই সকল লোক আমাকে কলিকাতায় লইয়া গেল, এবং এক পাপিষ্ঠ রমণীর নিকট বিক্রয় করিল।

রমণী হইয়াও সেই পাপিষ্ঠা আমার প্রতি যে কিরূপ অত্যাচার করিল, তাহা ভাবিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। বুঝি বা ভাল করিয়া বলিতে পারিলে পাষাণও দ্রব হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আর কাজ কি?

আমি তাহার পর থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। থিয়েটারের বাবুরা আমাকে লেখা পড়া ও সঙ্গীত শিখাইয়া তাঁহাদের অভিনেত্রী করিলেন। থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া দিন দিনই শৈশবকাহিনী ভুলিতেছিলাম। আমোদে প্রমোদে আত্মহারা হইতেছিলাম। ইহার মধ্যে আমাকে "বিল্বমঙ্গল" নাটকে বিল্বমঙ্গল সাজিতে হইল। বিল্বমঙ্গলের পাঠ অভিনয় করিতে করিতে আবার শৈশবকাহিনী স্মরণ হইল, অনুতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথায় গিয়া জুড়াইব? সমাজের পথে কণ্টক; এ বিশ্বসংসারে আমাদের কি জুড়াইবার জায়গা আছে?

অন্তরের এই জ্বালা লইয়াই এই সহরে আসিলাম। কাল আপনার উপদেশ শুনিলাম। আপনার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিয়া হৃদয়ে যে কি আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি আপনাকে দেখাইতে পারিব? দেখাইতে পারিলে আপনার দয়া হইত; আপনি বুঝিতে পারিতেন

আমার ন্যায় কৃপার পাত্রী সংসারে আর কেহই নাই।"

আমি অনিমেষ-দৃষ্টিতে রমণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। অশ্রুতে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রমণীরও নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে আমি বলিয়া উঠিলাম,—"রমণি! তুমি কি আমারই সেই প্রাণের বালিকা কুসুম? এই বার বৎসর পরে আজ তুমি পতিতা রমণী হইয়া আমার কাছে আসিলে! তোমার কলঙ্ককাহিনী আমাকেই শুনিতে হইল?"

রমণী আকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, তুমিই কি আমার প্রাণের দেবতা? তবে এই পাপীয়সীর মস্তকে একবার তোমার চরণ দুখানি রাখ; তোমার পবিত্র চরণ-স্পর্শে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হোক;—না প্রভু, এ কলঙ্কিনীকে তুমি স্পর্শ করিও না; তাহা হইলে তুমিও যে মলিন হইবে। তুমি দেবতা, দেবতাই থাক। আমি নরকের কীট, যাই—নরকেই ডুবিয়া যাই।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম "রমণি! যে স্রোতে ভাসিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার তাহার বিপরীত স্রোতে ভাসিয়া আমার নিকটেই আসিয়াছ। এখন কোথায় যাইবে? তুমি এতদিন পাপের পথে না চলিয়া পুণ্যের পথে চলিলে, আজ তোমার পুণ্যে আমিও ধন্য হইতাম। কিন্তু পাপের পথে চলিয়াছ বলিয়া আজ কি তোমার পাপের ভাগী হইব না? থাক রমণি! আমারই কাছে থাক; আমার সঙ্গে কঠোর বৈরাগ্য এবং দুষ্কর তপস্যা অবলম্বন কর। ঈশ্বরের দয়া হইবে। তিনি কলঙ্ক হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুসুম যথার্থই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিল এবং তদপেক্ষাও কঠোর তপস্যায় যে উন্নত জীবন লাভ করিল, আমি তাহার অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিলাম। তবুও কুসুম আপনার পাপের স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারিল না। আমাকে সে স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নয়, এই বিশ্বাসে দূরে থাকিয়াই আমাকে ভক্তি করিতে লাগিল; এবং সেবাব্রতে আপনার জীবন অর্পণ করিয়া আমাকে কহিল,—

"ইহজীবনে ঐ পবিত্র হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হইবার কল্পনাকেও মনে স্থান দিব না; কিন্তু যদি পরকালে পুণ্যজীবন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে হে প্রভু! আমাকে চরণে ঠেলিও না, আমাকে তোমারই আশ্রিতা দাসী বলিয়া গ্রহণ করিও।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

এক বণিকের ছুটী মেয়ে স্বভাব স্বতন্তর,
বড় মেয়েটী অহঙ্কারী বড়ই স্বার্থপর ;
ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সকল ভাল চাই,
একটু খানি কসুর হলে আর রক্ষা নাই।
নামটী তার রাণীমণি, মায়ের প্রিয় অতি ;
মা কখনো বড় কথাটী ক'ন না তার প্রতি।
যাই ইচ্ছা তাই করে মায়ের আদর পেয়ে,
সবায় করে হেয়জ্ঞান, (থাকে) নিজের বড়াই নিয়ে।
থর থরে তার কথাগুলা হাড় জ্বালয়ে যায়,
চখে মুখে ডেমাক ভরা, ফুটে বাহিরায়।
ঘরে বসে ভাবন করে সই স্বজনী নিয়ে,
দিনযামিনী কাটায় শুধু পরের মন্দ গেয়ে।
বসন ভূষণ ময়লা হবে—ঘাম ঝরিবে গায়,
এই ভয়েতে রাণীমণি খাট্‌তে নাহি চায়।
ছোট মেয়েটী শান্তশীলা হারায়েছে মায়,
বড়ই নরম, লজ্জা সরম মাখা তার গায়।
রূপে গুণে বড়ই ভাল, মুখে সদাই হাসি,
ফুটন্ত গোলাপ যেন বিলায় প্রীতিরাশি।
সবাই কত ভালবাসে আদর করে তায়,
সৎমা তারে দেখ্‌তে নারে, কুচ্ছা (কুৎসা) সদা গায়।
রান্না বান্না বাসন মাজা ঘর নিকান করে,
যা কিছু সব কাজ কর্ম্ম গৃহস্থের ঘরে
একলা করে শান্তশীলা সদা হাসিমুখে,
হরিনামটী করি শেষে দিনটী কাটায় সুখে।

একদিন ঠিক্ দুপরবেলা রোদ ঝম ঝম করে,
শান্ত গেছে কলসী নিয়ে জল আনবার তরে।
কেউ কোথা নাই ঘাটে মাঠে, সবাই গেছে ঘর,
আশ্রয় নেছে পশু পাখী ছায়ার ভিতর।
হেন কালে একটা বুড়ী চলি লাঠির ভরে,
ঘনিয়ে আসি কহে মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে।
"বড় কাতরা মোর পরাণী পিপাসায় বালা।
জল এনে দে জুড়াও বাছা এ পিপাসার জ্বালা।"
ব্যস্ত হয়ে শান্তশীলা রমণীরে বলে,
এখনি জল আন্‌ব মাগো বস বৃক্ষতলে।
রমণীকে ছাওয়ায় রেখে জল তুলিতে গেল,
কূপ হতে জল নিয়ে শান্ত বুড়ীর কাছে এল।
শীতল জল উদর ভরে করি বুড়ী পান,
শান্তকে কয় "বড় তৃপ্ত হলো মা মোর প্রাণ।
ভেবোনাকো মোরে কভু ভিখারিণী বলে,
এসেছিনু মানুষ সেজে জল খাইবার ছলে।
বড় তুষ্ট হলাম আমি তোমার ব্যবহারে,
মনের মত একটি বর আজ দিব তোমারে।
যখন তুমি কথা কবে, আমার বরেতে
মণি মুক্তা গোলাপ ফুল ঝর্‌বে মুখ হতে।"

এই বলে সে আজব বুড়ী মিশয়ে কোথায় গেল,
কলসী নিয়ে শান্তশীলা ঘরে চলে এল।
জল আন্‌তে দেরি দেখে সৎমা রেগে কয়,
কিসের তরে এত দেরি বলত সমুদয় ?
শান্তশীলা যেমন বলে "শুনগো জননি !"
মণি মুক্তা গোলাপ ঝরে মুখ হ'তে অমনি।
অবাক্ হয়ে সৎমা বলে একি বালাই হোল,
মণি মুক্তা গোলাপ কিসে তোর মুখেতে এল ?
একে একে সকল কথা শান্ত জ্ঞাপন করে,
মণি মুক্তা গোলাপফুল রাশি রাশি ঝরে।
শান্তর কথা শুনে মাতা ভাবে মনে মনে,
এমনি ধারা পরীর বর রাণী পাবে কেমনে ?
তাড়াতাড়ি মাতা গিয়ে রাণীর কাছে ক'ন,
কলসী নিয়ে জল আনতে যাওনা যাছুধন !
মায়ের কথা শুনে রাগে রাণী জলে কয়,
দায় পড়েছে জল আনতে, ও আমার কর্ম্ম নয়।
যে থাকে তোর দাসী বাঁদী ডেকে বল তারে,
যা ইচ্ছা যখন বলে জ্বালাসনে আমারে।
এই বলিয়া গর গরিয়ে রাণী চলে যায়,
হাতটী ধরে কানে কানে বলেন মাতা তায়।
জল আনতে শান্তি ছুঁড়ী কূপের পরীর বরে,
মণি মুক্তা গোলাপফুল মুখ হ'তে তার ঝরে।
তাই দেখে মা এলাম আমি তোমার কাছে ধেয়ে,
কূপের ধারে একবারটী যাওনা কলস নিয়ে।
মণি মুক্তা গোলাপফুল ঝরবে তোমার মুখে,
পরীর বরে যাছুমণি থাকবে চির সুখে।
করতে বিয়ে তোমায় মাগো আসবে রাজার ছেলে,
কত সম্পদ হবে তার তোমায় ঘরে পেলে।
রাণী হয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করবে যত,
দেখে শুনে আমার প্রাণ জুড়াবে মা তত।
মায়ের জেদে অবশেষে রাণী হেসে কয়,
জল আনতে পারি যদি রূপার কলস হয়।
পাড়া হতে রূপার কলস মা আনিল চেয়ে,
গরব করে রাণী গেল জল আনতে ধেয়ে।
কূপের ধারে কলসী রেখে কতই ভাবে রাণী,
বুড়ী-বেশে পরী এসে কহে মৃদু বাণী :—
"বড় কাতরা মোর পরাণী পিপাসায় বালা,
জল এনেদে জুড়া বাছা এ পিপাসার জ্বালা।"
বুড়ীর কথা শুনে রাণী বলে রুক্ষ স্বরে,
"জল তুলিতে এসেছি কি তোরে দেবার তরে ?
এলে পরী বিম্বাধরী রূপের ডালা নিয়ে,
নেব বর মনের মত জল তাহারে দিয়ে।
তাই এসেছি জল তুলিতে কলসী কাঁকে করে,
নইলে আমি এত দূরে আস্‌বো কিসের তরে ?"
রাণীর কথা শুনে বুড়ী বলে কাতর স্বরে,

পিপাসায় ছাতি ফাটে জল দে না মা মোরে।
চোক রাঙায়ে রাণী তারে মুখ ঘুরায়ে কয়,
"ছাতি ফেটে মরনা কেন, যাওনা যমালয়।
জল দেবনা ছিটে ফোঁটা, লাথি দেব মুখে,
ফের যদি তুই কবি কথা আমার সম্মুখে।"
হেসে হেসে বলে পরী ধরি নিজের রূপ,
"বরদায়িনী পরী আমি, আমার যে এই রূপ।
গুণের মত বর তোমারে আজ যে নিতে হবে,
মুখ হ'তে সাপ বেঙ বেরুবে যত কথা কবে।"
এই না বলে পরী কোথা শূন্যে গেল মিশে,
আর দেখা নাই, পায় না রাণী খুঁজে তাহার দিশে।
কলস নিয়ে অধোমুখে রাণী আসে ঘর,
বলেন মাতা বলনা মাগো পেয়েছ কি বর?
"মাথা মুণ্ডু বর পেয়েছি," যেমনি রাণী কয়,
মুখ হ'তে তার সাপ আসাপা অমনি বাহির হয়।
ঘৃণায় মাতা আঁতকে উঠে কেঁদে কেঁদে বলে,
রাণীর বেলা হা বিধাতা এ কি বর দিলে?
কবি বলে—বিধির দোষ দেওয়া মাগো মিছে,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল আছে তার পিছে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

সম্রাট মার্কস অরিলিয়সের উপদেশ।

(৪৯৫ সংখ্যা—২৪৪ পৃষ্ঠার পর)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। তুমি ৩০০০ বৎসর বাঁচ, আর ৩০০০ গুণ ১০ হাজার বৎসর বাঁচ, যে জীবন তোমার আছে, তদ্ভিন্ন অন্য জীবন হারাইবে না এবং যে জীবন হারাইবে ভাবিতেছ, লোকান্তরে তা ছাড়া অন্য জীবনে জীবিত হইবে না। মানুষ তাহার ভূত বা ভবিষ্যৎ হারাইতে পারে না। যাহা মানুষের হস্তগত নাই, তাহা হারাইবে কিরূপে? বর্ত্তমানে যাহা মানুষের হাতে আছে, তাহাই সে হারাইতে পারে।

২। মানুষের আত্মা এই পাঁচ প্রকারে আপনার অনিষ্ট করে:—(১) যখন সে আপনার ভাল মন্দ কিছু ঘটিলে চঞ্চল হয়; (২) যখন সে ঘৃণাপূর্ব্বক কোনও মানবের প্রতি বিমুখ হয়, কিম্বা কাহারও অনিষ্ট চেষ্টায় তাহার প্রতি ধাবমান হয়; (৩) যখন সুখ বা দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়; (৪) যখন শঠতা করে এবং অসত্য বা কপট ভাবে কোনও কথা বলে বা কোন কাজ করে; (৫) যখন চিন্তাহীন বা লক্ষ্যহীন হইয়া কোনও কাজ করে।

৩। মানুষের জীবনের পরিচালক কে? সে কেবল একটি জিনিষ—(Philosophy) দর্শন। এই দর্শন

কি? মানুষের মধ্যে যে দেবপ্রকৃতি আছে, তাহাকে অনাহত ও অক্ষত রাখা, দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখ দুঃখের অতীত হইয়া থাকা, বিনালক্ষ্যে এবং অসত্য বা কপটভাবে কোনও কার্য্য না করা এবং অন্যের কার্য্যাকার্য্যে নিজের অভাব বোধ না করা; আর যা কিছু ভাগ্যে ঘটিবে তাহা এই ভাবে গ্রহণ করা যে, নিজে যে স্থান হইতে আসিয়াছি, ইহাও সেই স্থান হইতে আসিতেছে। সর্ব্বশেষে প্রফুল্ল অন্তরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। মৃত্যু আর কিছুই নয়, প্রত্যেক জীবদেহ যে পঞ্চভূতে গঠিত, তাহাতেই তাহার পরিণতি।

৪। তোমার জীবনের অবশিষ্ট সময় অপরের চিন্তায় বৃথা ক্ষয় করিও না। অপরের চিন্তা যাহা করিবে, তাহা যেন সরল ও সদ্ভাবপূর্ণ হয়, ইহাই সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীবের উপযুক্ত। আমোদ বা ইন্দ্রিয়-সুখচিন্তা তাহার গ্রাহ্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, সন্দেহ এবং যে সকল কুভাব তোমার মনে আছে—ফুটিয়া বলিতে লজ্জা হয়, তাহা চিন্তা করিও না।

যে ব্যক্তি এইরূপ সাধু লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে চান, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? না যে ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তিনি আপনাকে তাঁহার পুরোহিত বা সেবক বলিয়া জানিবেন। এরূপ ব্যক্তি আমোদে মলিন হন না, কোনও লোক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না, কোনও অপমানে অত্যাচারে বিচলিত হন না। তিনি কোনও রিপুদ্বারা পরাভূত হন না, ন্যায়-নিষ্ঠায় গভীর ভাবে অনুরঞ্জিত; ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহা বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া আনন্দপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, অন্যে যাহা বলে, করে, বা ভাবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লেশ পান না।

৫। অনিচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কার্য্যে খাটিও না। সাধারণ মঙ্গলচিন্তা এবং যথোচিত বিবেচনা না করিয়া অথবা একাগ্রমনা না হইয়া কোনও কার্য্য করিও না। বহু-কার্য্যে ব্যস্ত হইও না। মৃত্যুর জন্য আহুত ব্যক্তির ন্যায় প্রস্তুত হও অথচ প্রফুল্লচিত্ত হও। মনের শান্তির জন্য বাহ্য উপায়ের উপর নির্ভর করিও না। মানুষ নিজেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে, অন্যে তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিলে কি ফল?

৬। মানবজীবনে ন্যায়, সত্য, মিতাচারিতা, সাহসিকতার ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই। যুক্তিদ্বারা স্বভাবতঃ যে কার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। যে ঈশ্বর তোমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং সমুদায় প্রবৃত্তি যাঁহার অধীন; তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রভু কেহ নাই।

৭। কোন্ কার্য্য লাভজনক নয়? যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য করে, আত্মগৌরব নষ্ট করে, কোনও মানুষকে ঘৃণা, সন্দেহ বা অভিসম্পাত করিতে বা কপটাচরণ করিতে শিক্ষা দেয়। নিঃসঙ্গতা বা সঙ্গবত্তা কাহার

প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি আপনার জ্ঞান ও দেবপ্রকৃতি এবং আত্মগুণ-মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ করে, এরূপ ব্যক্তিকে অনুশোচনা করিতে বা শোচনীয় কোনও কার্য্য করিতে হয় না। বিশেষতঃ এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রার্থনা করে না এবং মৃত্যুভয়ে কোথাও পলায়ন করে না। যদি এখনই পরলোকে যাত্রা করিতে হয়, তিনি যেন শান্ত ভাবে কোনও কার্য্য করিতে যাইতেছেন, এইরূপ ভাবে পরলোক যাত্রা করেন।

৮। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক দণ্ডভোগ করিয়া সংশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুষ্টভাব, অপবিত্রতা বা চামড়া-ঢাকা ক্ষত দেখিতে পাইবে না। কোনও অভিনেতা তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ না করিয়া নাট্যশালা হইতে চলিয়া গেলে যেমন তাহার কার্য্য অসম্পূর্ণ বলা যায়, এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার জীবনকে সেরূপ অসম্পূর্ণ বলা যায় না। আরও এরূপ ব্যক্তির মধ্যে নীচতা ও দাম্ভিকতা থাকে না, কোনও বিষয়ে গাঢ় আসক্তি বা একান্ত ঔদাসীন্য অথবা নিন্দার্হ বা গোপনীয় কোনও দোষ থাকে না।

৯। সুখলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি? উপস্থিত কার্য্যে রত হও, গম্ভীরভাবে—দৃঢ়ভাবে—শান্তভাবে সুযুক্তির অনুসরণ করিয়া চল; কিছুতেই আপনাকে বিচলিত হইতে দিও না; আত্মস্থ ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রাখ, তাহা অবিলম্বে ঈশ্বর-হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, ইহা মনে রাখ। যদি এই ভাব দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক, অথচ কোনও আশা ভয় মনে না রাখিয়া স্বভাবের ইঙ্গিতানুসারে বর্ত্তমান কার্য্যশক্তি লইয়া কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাক এবং নির্ভীক হইয়া প্রত্যেক কথা সত্য বল, তুমি সুখ লাভ করিবে এবং সে সুখ হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

১০। সাধু ব্যক্তির বিশেষত্ব কি? ভাগ্যে যা ঘটে, তাহাতেই তিনি সুখী ও সন্তুষ্ট। তাঁহার অন্তরে যে ঈশ্বরের অখণ্ড প্রকৃতি আছে, তাহাকে অপবিত্র বা অন্য বহু বস্তর প্রতিমূর্ত্তিদ্বারা বিকৃত করেন না। তিনি সর্ব্বদা ইহাকে শান্তভাবে রক্ষা করেন এবং সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া ভক্তি নিষ্ঠার সহিত ইহার অনুগত হইয়া চলেন। তিনি সত্যের বিপরীত কোনও কথা বলেন না, অথবা ন্যায়ের বিপরীত কোনও কার্য্য করেন না। তাঁহার জীবন সরল, নম্র এবং সন্তোষময়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি ইহা বিশ্বাস না করে, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হন না এবং আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন না। প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য শান্ত ও পবিত্র হইয়া এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়া এই আদর্শের অনুসরণ করা, কোনও চাপে মানুষকে যেন অবস্থার ক্রীতদাস না করে। তিনি স্বাধীন ভাবে আপনার ভাগ্য গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবেন।

উদাসীনের চিন্তা।

বিধুভূষণ ঘোষের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তবর্ত্তী এক গ্রামে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এক দিন তাঁহারই সমপাঠী হরিরাম চক্রবর্ত্তী উপস্থিত হইয়াছেন। হরিরামের সহিত তাঁহার একাত্মভাব। উভয়ে একত্র পাঠ করিয়া থাকেন, উভয়ে একত্র বেড়াইতে যান। উভয়ে অবসরকালে একত্র বসিয়া অনেক সুখ দুঃখের কথা আলাপন করেন, সময় সময় গুরুতর গুরুতর বিষয়ের প্রসঙ্গও করিয়া থাকেন। হরিরাম বিধুভূষণের সহিত দুই চারি কথা বলিবার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রম ত্রুটি সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

হরিরাম—ভাই, স্ত্রীলোকটিকে বি এ পরীক্ষায় (first) প্রথম করিয়া দিল। এ কেমন বিচার! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও জুয়াচুরী আছে। তা না হ'লে মেয়ে ব'লে দয়াও হ'তে পারে।

বিধুভূষণ একটু প্রশস্তমনা। তিনি জানিতেন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিগত কোনও শক্তি-বৈষম্য নাই। কেবল অনুশীলনাভাবেই স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারেন না। তাই বন্ধুর তাদৃশ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"এ তোমার নেহাতই অন্যায়, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা মূলেই ভুল। কেন মেয়েরা কি আর ভাল পাশ কর্ত্তে পারে না? ভাল পাশ করা কি পুরুষদেরই একচেটিয়া?"

হরিরাম—certainly (নিশ্চয়ই) *। কেলেণ্ডার খুলে দেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি একটি মেয়েও কোনও পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইয়াছে কি না?

বিধুভূষণ—এত বেশ যুক্তি! দশ বছর পুরুষ প্রথম হয়েছে বলে কি একাদশ বছরেও তারাই প্রথম হবে। মেয়েদের মানসিক শক্তি কি স্বভাবতঃ ছেলেদের চেয়ে কম?

হরিরাম—তা কম বই কি? তুমি কি brain এর (মস্তিষ্কের) এভারেজ (মোট) ওজন জান না? তাদের এভারেজ পুরুষের এভারেজ চেয়ে কম। তা :ভিন্ন convolution (গঠনেও) প্রভেদ আছে।

বিধুভূষণ—তোমার কথা যদি মেনে ও নি, তবুও বলি এ পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে, অনুশীলনজাত।

হরিরাম—যে কারণেই হউক আছেত, তবে মেয়ে ফার্ষ্ট হয় কি করে? পরীক্ষক grace অনুগ্রহ mark দিয়ে থাকবেন,

* হরিরামের বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরেজি বলা অভ্যাস। আবার মনে পড়িলেই অনুবাদ করিয়া অভ্যাসের দোষ সংশোধন করেন। লেঃ—

তা না হলে এরূপ হতে পারে না। আর যদি—

বিধুভূষণ—বাধা দিয়া বলিলেন আর যদি কি?

হরিরাম—কেন, ঘুষের ব্যাপার?

বিধুভূষণ—ছি! ছি! মেয়েদের সম্বন্ধে ওসব কথা মুখে এন না। তাদের ধর্ম্ম-ভীরুতা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি, আরও তোমাদের মত তাদের এত সাহস নাই।

হরিরাম—তুমি ভাই কিন্তু একপেশে হয়ে চলেছ। আমি এরূপ gallantry (স্ত্রী-পক্ষপাত) নেটিভদের মধ্যে বড় দেখি নাই। বেশত gallantry নেহাত মন্দ নয়, তবে ভেবনা এই বলে স্থায় তোমার দিকে। পুরুষেরা যা করেবয়ে যায়, মেয়েরা সুযোগ পেলে তা কর্ত্তে বড় ছাড়ত না, তবে তাদের পক্ষে সে সুযোগ পাওয়া ভার। তারা বোর্ডিঙের চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকে, তাদের সে সুবিধা কোথায়?

বিধুভূষণ—তবে ত দেখছি তুমি আমার কথাই মেনে নিলে।

হরিরাম—মেনে আর নিলুম কই? সুযোগ অভাবে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকা এক কথা আর বিতৃষ্ণা হতে কিংবা ধর্ম্ম-ভয়ে নিবৃত্ত থাকা আর এক কথা।

বিধুভূষণ—যাক, আমার মতে স্ত্রী-জাতি একটু বেশি ধর্ম্মবিশ্বাসী। তর্কমুখে যদি তাও স্বীকার না কর, তবু এবারে বি এতে যিনি ফার্ষ্ট হয়েছেন, তিনি কোন অসদুপায়ে তা হন নাই, একথা ঠিক্ হল।

হরিরাম—অসদুপায়ে হন নাই একথা মেনে নিলেও আর এক কথা ত উড়ে গেল না—মস্তিষ্কের প্রভেদ আছে।

বিধুভূষণ—তোমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে একটি অনুমানের উপর নির্ভর করে। সেটি এই যে মেয়েদের প্রতি প্রকৃতিই যেন একটু নারাজ, তাই পুরুষদের চেয়ে কম শক্তি দিয়েছেন।

হরিরাম—হাঁ, আমি তা বিশ্বাস করি এবং আমার বিশ্বাসের ভাল (ground) ভিত্তিও আছে। আমি আগেই বলেছি যে, মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন ও গঠন-প্রণালী পুরুষদের হ'তে স্বতন্ত্র।

বিধুভূষণ—মানসিক শক্তি মস্তিষ্কের উপর যে যোল আনা নির্ভর করে, আজিও বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বলেন না। যদি মেনে নি যে তাদের মস্তিষ্ক এরূপ, তা হলেও বলব যে আনুক্রমিক সঞ্চালনে যিনি প্রথম হয়েছেন, তার মস্তিষ্ক অন্য মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়েছে।

হরিরাম—তোমার কথা শুনে আর হাসি রাখা যায় না। অনুশীলনের জন্ম যে development (বিকাশ) তা এক পুরুষে হয় না। পুরুষানুক্রমে সেরূপ অনুশীলন হ'তে থাকলে পরে তা হ'লেও হ'তে পারে। বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা আর কদিনের? মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর আর বেথুন সাহেবই যা কিছু করেছেন। এত এক পুরুষ কি বেশী জোর দুপুরুষের কথা!

বিধুভূষণ—তুমি দেখছি কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নও। কেন এক পুরুষে আর কি এরূপ বিকাশ হতে পারে না? প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর সেণ্ডো সাহেব ছেলে বেলা ক্ষীণশরীর ছিলেন। কিন্তু অনুশীলনের ফলে এখন একজন বিখ্যাত পালোয়ান ব'লে পরিচিত হয়েছেন।

হরিরাম—এত গেল শরীরের কথা।

বিধুভূষণ—তুমিও ত শরীরের কথাই বলছ, ভাল মস্তিষ্কটা কি শরীর নহে?

হরিরাম—তোমার যুক্তিই ভাই স্বতন্ত্র। সেণ্ডো সাহেবের শরীর অনুশীলনে muscular (সংবর্দ্ধিত পেশীযুক্ত) হয়েছিল, কিন্তু অনুশীলনে শরীরের (structure) গঠন বদলে যায় নাই। আর তুমি যা বলতেছ, তা তত আয়তন বৃদ্ধির কথা নহে, সে গঠন বদলের কথা।

বিধুভূষণ—কেন আয়তন বৃদ্ধি হইলেই ত মস্তিষ্কের ওজনও বেড়ে উঠবে? তুমি কি মস্তিষ্কের ওজন একটা পার্থক্যের কারণ মনে কর না?

হরিরাম দেখিলেন এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্কের গড়পড়তা ওজন সম্বন্ধে যে যুক্তি করিতেছিলেন, তাহা অকাট্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না; তখন সুর বদলাইয়া বলিলেন, "মানিলাম তোমার এ কথাটার মধ্যে কতকটা সার আছে, তার পর convolution (গঠন) কথাটার কি?"

বিধুভূষণ—কেন? যেমন মস্তিষ্ক মনের উপর কার্য্য করে, মনও সেইরূপ মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করে থাকে। একদিকে convolution এর পার্থক্য জন্য মানসিক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে তারতম্য হয়; আবার মানসিক শক্তির সঞ্চালন হইতে হইতে তৎসঙ্গে সঙ্গে convolutionও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সে হিসাবে বালিকা বয়স হইতে আমাদের সমালোচ্য মহিলার মাথা বদলে গিয়েছে।

হরি—not perfectly convinced—সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। তবুও আমি পুনর্ব্বার ভেবে দেখব। কিন্তু ভাই, স্ত্রীলোকেরা যদি এরূপে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হতে থাকে, তা হলে ত আমাদের চাকরী পাওয়াই দুর্ঘট।

বিধুভূষণ—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না। আমাদের দেশে সে অবস্থা অনেক দূরে। মেয়েরা বহুকাল পুরুষের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কর্ত্তে পার্ব্বে না, কেননা তাঁদের আত্মীয় স্বজনগণই তার বিরোধী।

হরিরাম—সে যাক্ "To be forewarned is to be fore-armed সাবধানের মার নাই। এস আমরা একটা সমিতি করি, তার উদ্দেশ্য থাকবে protection of rights of the males (পুরুষদিগের স্বত্ব রক্ষা করা)।

বিধুভূষণ—এর সঙ্গে privilege কথাটাও যোগ কর, কারণ তোমাদের rights মেয়েদের rights এর প্রতিকূল। তবে যে কোন কারণেই হউক, পুরুষগণ কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করেছেন। তা

রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে বরং ইষ্ট না হয়ে অনিষ্ট হ'তেছে ও হবে, ইহা আমার বিশ্বাস। আমি তোমার এ সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মতের সহিত এক হ'তে পার্চ্ছেনা।

এ স্থলেই উভয়ের কথায় যতি পড়িল, কারণ কেহই কাহারও প্রবোধ জন্মাইতে পারিলেন না।

শ্রীচঃ—

প্রকৃতি ও আত্মা।

(১)

"আমি বড় ঋতু নিয়ে খেলা করি—
বসন্ত হ'তে বসন্তে;
তুমি চাহ, চিরমধু থাকে ভরি
বনান্ত হতে বনান্তে।"
লভিতে সুখের সম্বল,
তোমারে আর না সাধিব।
তুমি যদি অতি চঞ্চল,
চির সুন্দরে ডাকিব।

(২)

"আমি প্রেমসেতু প্রাণে বাঁধিয়া হে
ভাঙ্গি যে তারে ক্ষণান্তে;
তুমি ভ্রমহেতু চাহ কাঁদিয়া হে
ভ্রমিতে পথ অনন্তে।"
করগো যা চাহ করিতে,
ও সেতুতে নাহি চড়িব।
ব্রহ্মচরণ-তরীতে
স্থির সেতু আমি গড়িব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মহর্ষি ঈশার উপদেশের সার।

মানবজীবনের আদর্শ।

তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও সেইরূপ পূর্ণ হও।

ধন্য কাহারা?

(১) দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য। (২) ঈশ্বর-বিরহে শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। (৩) বিনয়ীরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। (৪) ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা পূর্ণকাম হইবে। (৫) দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দয়া লাভ করিবে। (৬) নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। (৭) শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে। (৮) ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

হত্যা বিষয়ে।

প্রাচীন উপদেশ—হত্যা করিবেক না।

যে হত্যা করিবেক, সে ঈশ্বরের বিচারাধীন হইবেক। আমি বলি যে ব্যক্তি বিনা কারণে ভ্রাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেক, সে ঈশ্বরের বিচারাধীন হইবেক। যে ভ্রাতাকে "নির্ব্বোধ" বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবেক, সে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবেক। ভ্রাতার সহিত বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে আসিলে সে পূজা তাঁহার গ্রাহ্য হইবেক না।

ব্যভিচার।

প্রাচীন কালের উপদেশ—ব্যভিচারী হইবেক না। কিন্তু আমি বলি যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি করে, সে অন্তরে ব্যভিচারী হইল।

বিবাহচ্ছেদ।

প্রাচীন কালের উপদেশ—যে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেক, সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক। কিন্তু আমি বলি ব্যভিচার অপরাধ ব্যতীত যে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করে এবং এইরূপ পরিত্যক্তা নারীকে যে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচারী।

শপথ বিষয়ে।

স্বর্গ কি পৃথিবী বা তীর্থস্থানের নামে বা মাথার দিব্য দিয়া কি অন্য কোন প্রকারে শপথ করিও না। "বোধ হয় হাঁ, না" এরূপ কথা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পার না।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার।

প্রাচীনকালের উপদেশ—চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত। কিন্তু আমি বলি অত্যাচারের প্রতিঘাত করিও না। যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তার নিকট বাম গণ্ডও ফিরাইয়া দাও। যে আদালত করিয়া গায়ের কোট লইয়া যায়, তাহাকে ক্লোক (অথবা বহিরাবরণও) দাও।

কাহাকে প্রেম করিবে ?

প্রাচীনকালের উপদেশ—প্রতিবাসীকে ভালবাসিবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি বলি তোমার শত্রুদিগকেও ভালবাস ; যাহারা অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর ; যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদিগের মঙ্গল কর; এবং যাহারা বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া নিপীড়ন করে, তাহাদিগের কল্যাণ প্রার্থনা কর।

ভিক্ষাদান।

কপটদিগের ন্যায় লোক দেখাইবার জন্য বাজনাবাদ্য করিয়া দান করিও না। তুমি যখন দান করিবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা যেন বাম হস্তও জানিতে না পারে।

প্রার্থনা।

কপটদিগের ন্যায় লোক দেখাইবার জন্য দেবালয় বা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া অধিক কথা বলিয়া প্রার্থনা করিও না। প্রার্থনাকালে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া গোপনে গুপ্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি গোপনে সকল শুনিবেন এবং প্রকাশ্যে পুরস্কার দিবেন।

প্রার্থনার আদর্শ।

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা! তোমার নাম ধন্য হউক ; তোমার রাজ্য অবতীর্ণ

হউক, স্বর্গেতে যেমন, পৃথিবীতে তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদের আজিকার আহার আজ দাও এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমরা যেন অন্যের পাপ ক্ষমা করি। আমাদিগকে প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না, কিন্তু পাপ হইতে উদ্ধার কর। কারণ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও গৌরব তোমারই চিরদিন।

উপবাস বিষয়ে।

কপটদিগের ন্যায় লোক দেখাইবার জন্য উপবাস করিয়া বিবর্ণমুখ হইয়া থাকিও না। তুমি যখন উপবাস করিবে, মাথা তৈলাক্ত ও মুখ ধৌত করিবে। অন্তর্যামী ঈশ্বর গোপনে তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে তোমায় পুরস্কার দিবেন।

কোথায় ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে ?

যেখানে তোমার ধন, সেখানেই তোমার মন থাকিবে। অতএব পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিও না; সেখানে পোকায় খায়, মরিচা ধরে এবং চোর প্রবেশ করিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। স্বর্গেতে তোমার ধন চঞ্চয় করিয়া রাখ, সেখানে পোকায় খায় না, মরিচা ধরে না এবং চোর প্রবেশ করিয়া অপহরণ করিতে পারে না।

কল্যকার জন্য চিন্তা কেন ?

কি খাইব, কি পরিব—এ চিন্তা ক্ষীণবিশ্বাসীর লক্ষণ। বিধাতা আকাশের পক্ষীদিগকে খাওয়াইতেছেন এবং মাঠের তৃণ সকলকে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করিতেছেন। ইহাদের অপেক্ষা মনুষ্যকে তিনি শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অন্ন বস্ত্রের অভাব তিনি জানেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, তিনি আর সকল তোমাদিগকে দিবেন।

কিরূপে বিচার করিবে ?

হে বিচারক! তোমারও বিচারকর্ত্তা আছে, বিচারকালে ইহা ভুলিও না। যে নিয়মে তুমি বিচার করিবে, সেই নিয়মে তুমিও বিচারিত হইবে এবং যে দণ্ড অন্যকে দিবে, সেই দণ্ডে তুমিও দণ্ডিত হইবে। আপনার চক্ষে তাল থাকিতে অন্যের চক্ষের তিল বাহির করিতে যাইও না। হে কপট! অগ্রে আপনার চক্ষের তালটা বাহির কর, পরে পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে ভ্রাতার চক্ষের তিলটী বাহির করিতে সমর্থ হইবে।

অযোগ্য পাত্রে উপদেশ।

পবিত্র বস্তু কুক্কুরকে দিলে এবং শূকরের নিকটে মুক্তা ছড়াইলে তাহারা তাহা পদদ্বারা দলিত করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিবে।

প্রার্থনার উত্তর।

মানুষ মলিন জীব হইলেও পুত্র রুটী চাহিলে পাথর দেয় না এবং মৎস্য চাহিলে সাপ আনিয়া দেয় না। স্বর্গস্থ পিতার নিকট ভাল জিনিষ চাহিলে তিনি কি সন্তানকে তাহা দিবেন না? প্রার্থনা কর, লাভ করিবে; অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত

হইবে; দ্বারে আঘাত কর, ইহা তোমার প্রতি উন্মুক্ত হইবে।

নীতি ও ধর্ম্মের সার।

অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর।

ঠিক্ পথ।

যে দ্বার সঙ্কীর্ণ এবং যে পথ সুক্ষ্ম, তাহাই অক্ষয় জীবনের পথ; অল্পলোকে এ পথের সন্ধান পায়। যে দ্বার বৃহদায়তন ও যে পথ প্রশস্ত, তাহা মৃত্যুর পথ; বহুলোকে এই পথের পথিক!

ভাল ও মন্দ ধর্ম্মপ্রচারক কিরূপে চেনা যায়?

ভাল বৃক্ষ ভাল ফল এবং মন্দ বৃক্ষ মন্দ ফল উৎপাদন করে। মন্দ হইতে ভাল ফল এবং ভাল হইতে মন্দ ফল কখনও ফলে না। ফল দ্বারা তাহাদিগের পরিচয় পাইবে।

ঈশ্বরের রাজ্যে কে যাইবে?

আমার উপদেশ শুনিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করিবে, সেই তাঁহার স্বর্গরাজ্যে যাইবে। যে ব্যক্তি আমার উপদেশ শুনিয়া আমার শিষ্য বলিয়া মুখে পরিচয় দিয়া কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করিবে, সে আমার শিষ্য নহে এবং ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই।

দেরাদুন কন্যাপাঠশালা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে আমরা এই বিদ্যালয়ের কথা কিছু লিখিয়াছিলাম। এবার পূজাবকাশে দেরাদুনে গিয়া ইহার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। শ্রীমতী কোরা দেবীর বিশেষ উদ্যোগে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার ফণ্ডে তিনি স্বয়ং ৩০০০ হাজার টাকা দান করেন। তদ্ভিন্ন মাসিক অর্থদান ও নিয়মিত শিক্ষাদান করিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় ৯ জন স্ত্রীলোক এবং শিক্ষকশ্রেণীতে ১০টী রমণী আছেন। কয়েক জন পুরুষ ইহাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালীও আছেন। লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাদেবী বিনা বেতনে কার্য্য করিয়া থাকেন। বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ চন্দ্রমুখীর ভগিনী কুমারী কামিনী বসু প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বস্তুবিচার, সেলাই, রন্ধন ও গান এবং শাস্ত্র ও স্তোত্রপাঠ—এই সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অল্প দিনের মধ্যে

বালিকাদের পাঠের বেশ উন্নতি হইয়াছে এবং বালিকাসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৭৫ স্থানে ৯০ হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের ফণ্ডে কমিটীর যত্নে ২৫, ৭৮৩৸/০ স্বাক্ষরিত হইয়া দশ হাজার টাকার উপর উঠিয়াছে। প্রধান দাতাদিগের নাম :—

শ্রীমতী কোয়া দেবী	৩০০০
লালা বলরাম সিং ও রামদেবী, সেঠ লক্ষীচাঁদ	৫০০০,
টেহিরীর মহারাজা সার কীর্ত্তিসা বাহাদুর	৫০০০,
মহন্ত লছমন দাস	১০০০,
বাবু জ্যোতিঃস্বরূপ	১০০০,

বাবু জ্যোতিস্বরূপ স্থানীয় প্রধান উকিল। তিনি এই বিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর। তিনি ও তাঁহার গুণবতী স্ত্রী বিবিধ উপায়ে এই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ ও উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ একটী ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চান, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা বলি দুঃখ করিবার কারণ নাই। কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিতে থাকুন, যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা এক বৎসরে যখন আড়াই হাজারের উপর ব্যয় করিয়া ১০,০০০ টাকার অধিক মজুত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন আর দুই এক বৎসরের চেষ্টায় কন্যাপাঠশালার গৃহ ও ছাত্রীনিবাস প্রভৃতি সমুদায় আবশ্যক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজী প্রবচন।

পুরাতন ও নূতন।

১। বৃদ্ধ বয়স মাননীয়।

২। বৃদ্ধ বয়স ঘৃণিত হইলেও সকলের প্রার্থনীয়।

৩। বুড়া শক্ত, কচি নরম।

৪। বুড়ো বাঁচে, ছেলে মরে।

৫। বৃদ্ধ মৌমাছি মধু দেয় না।

৬। বৃদ্ধ পক্ষীদিগকে তুঁষ দিয়া ধরা যায় না।

৭। বুড়ো গরুর বাচ্চা হয় না।

৮। সত্যহীন প্রাচীন প্রথা ভ্রান্তিমাত্র।

৯। পুরাতন মৎস্য, পুরাতন তৈল ও পুরাতন বন্ধু সর্ব্বোত্তম।

১০। বুড়ো শৃগালের শিক্ষকের দরকার নাই।

১১। পুরাতন মাথা ও নবীন হস্ত।

১২। বৃদ্ধ লোক দ্বিগুণ শিশু।

১৩। বৃদ্ধ লোকে মৃত্যুর কাছে যায়, কিন্তু মৃত্যু যুবকের কাছে ঘনায়।

১৪। পুরাতন হিসাবে নূতন বিবাদ।

১৫। পুরাতন ছালায় অনেক তালি দরকার।

১৬। পুরাতন ঘা প্রায় সারে না।

১৭। পুরাতন পাপ নূতন লজ্জার কারণ হয়।

১৮। যত বৃদ্ধ, তত জ্ঞানী।

১৯। নূতন ঝাঁটায় পরিষ্কার ঝাঁট।

২০। নূতন খাদ্যে নূতন ক্ষুধা আনে।

২১। নূতন শোক পুরাতনকে জাগায়।

২২। নূতন সম্মানে আচরণ বদলায়।

২৩। নূতন প্রভু নূতন আইন।

২৪। নূতন জিনিষে লোকের বেশী চোখ পড়ে।

২৫। পুরাণ বোতলে নূতন সুরা।

আমার অদৃষ্ট।

আমি তিন বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হইলেও দুই জন লোকের স্নেহ ও যত্নে মায়ের অভাব বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের স্নেহের আশ্রয়ও মাতৃক্রোড়ের মত দৃঢ়, মাতৃক্রোড়ের মত অভয়প্রদ এবং মাতৃক্রোড়ের মত মঙ্গলময়। সেই দুই জন লোক—একজন আমার বাবা, আর একজন আমার ভ্রাতৃজায়া—আমার বৌদিদি।

আগে বাবার কথা বলি। যখন দাদার বয়স ষোল বৎসর, তখনই এই হতভাগিনীর জন্ম হয়। একে শেষ বয়সের সন্তান, তার উপরে তিন বৎসর বয়সে মাতৃহীনা, সুতরাং আমি বাবার বড়ই আদুরে মেয়ে হইয়া উঠিলাম। বাবা আমার নাম রাখিয়াছিলেন 'শান্তি'।

ক্রমশঃ আমি সাত আট বৎসরের হইলাম। সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে, এই অযোগ্য সন্তানেতেও বাবা কত গুণ—এমন কি কত মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত দেখিতে পাইতেন! তাই তিনি আমাকে কেবল ভাল গহনা, ভাল কাপড় এবং ভাল ভাল খেলানা দিয়া তৃপ্ত হইতেন না, আমার সুশিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ঘরে শিক্ষক রাখিয়া আমাকে বাঙ্গালা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষা শিখাইতেন। নিজে আমাকে ধর্ম্ম, নীতি এবং দেশ বিদেশের অসাধারণ নারীচরিত্র সকল পড়াইতেন। আমার সেই বাল্যকালে সংসারি-জীবনের এক রমণীয় উজ্জ্বল আনন্দময় ছবি মনে অঙ্কিত হইতেছিল—সে আমার সেই পিতৃদেবের প্রসাদে; আর আজি যে বামাবোধিনীতে দুইটী মনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, ইহাও আমার সেই পিতৃদেবের প্রসাদে।

আর আমার বৌদিদি; সেই স্নেহময়ী—যিনি আমাকে কত যত্নে কত স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি করিয়া দিব? তিনি স্বহস্তে আমাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইয়া দিতেন, প্রায় সকল কাজ স্বহস্তে করিতেন; রাত্রিতে আমাকে কোলে করিয়া শুইতেন। বাড়ীতে ঝি ছিল, চাকর ছিল, কিন্তু আমার কাজ বৌদিদি আর কাহাকে করিতে দিতেন না—নিজের হাতে করিতেন। আমি ছোট বেলায়

মনে মনে ভাবিতাম "খুঁটী সুমতি, সরোজিনী সবাই মায়ের পেটে জন্মিয়াছে, আমি জন্মিয়াছি আমার বৌদিদির পেটে!" বৌদিদি আমার চাইতে মোট নয় বৎসরের বড়, তথাপি তাঁহার শিশু-পালনে এত অভিজ্ঞতা!

আমি কিছু বড় হইলে বৌদিদি আমাকে সেলাই ও ঘরকন্নার কাজ শিখাইতে লাগিলেন। এক দিন দাদার ছেঁড়া জামা আমি এমন সুন্দর রিপু করিয়াছিলাম যে, তাহা দেখিয়া দাদা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; বৌদিদিকে তামাসা করিয়া বলিলেন "বাবা আর তুমি সত্যই শান্তিকে আদর্শ নারী করিয়া গড়িতেছ নাকি?" পতিপ্রাণা সাধ্বী হাসিয়া উত্তর করিলেন "শান্তির ভাইটি যখন পুরুষ কুলের আদর্শ, বোনটী তখন না হইবে কেন?"

আমার বয়স যখন এগারো বৎসর, তখনই বাবা আমার বিবাহের জন্য "সুপাত্র" খুঁজিতে লাগিলেন। বাবার এই কাজে বৌদিদিও সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। হায়! অদৃষ্ট-লিপি! তুমি মানবের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়!

(২)

এতক্ষণ যাঁহারা আমার সুখের কথা শুনিয়া সুখী হইতেছিলেন, এখন সেই সব সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমার দুরদৃষ্টের আরম্ভ দেখুন। আমি বারো বছরে পা দিতেই আমার বাবা—আমার সেই স্নেহময় করুণাময় বাবা, আমার রক্ষক, শিক্ষক, প্রতিপালক বাবা আমাকে সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন! আমি বৌদিদির কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলাম, কিন্তু সে নিষ্ঠুর মৃত্যু আমার বাবাকে আর ফিরাইয়া দিল না!

বাবার মৃত্যুতে আমাদের সংসারেও অনেক বিশৃঙ্খলা হইল। বাবা গবর্ণমেন্টের অধীনে চাকরি করিয়াছিলেন, দুইশত টাকা পেন্‌সন পাইতেন, তাহা বন্ধ হইল। দাদা নিজে একটা বড় ব্যারামে পড়িলেন, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু তিনি যে ব্যবসায় করিতেন, তাহা বন্ধ হইল। আমাদের সোণার সংসারে দরিদ্রতা প্রবেশ করিল।

এখনকার দিনে বঙ্গদেশে প্রায় সকলেই জানেন, কন্যা সুপাত্রে দিতে হইলে অনেক পয়সা ব্যয় করিতে হয়। আমার দাদার টাকা পয়সার টানাটানি হইতে লাগিল। এদিকে বয়স তেরো বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল; তাই প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীকে অবিবাহিতাবস্থায় রাখাতে গ্রামের লোক সকল যখন দাদাকে বড় নিন্দা করিতে লাগিল, তখন দাদা তাড়াতাড়ি আমার জন্য এক পাত্র ঠিক্ করিলেন।

যথাসময়ে "যথাসম্ভব" রকমে আমার বিবাহ হইল। সাবিত্রীর সত্যবানের মত, জুলিয়েটের রোমিওর মত, কি উপন্যাসের নায়িকার প্রণয়ীর মত, বিবাহের আগে আমি বর দেখিলামও না, ভাল বাসিতেও পাইলাম না। শুনিলাম

পাত্র বড় ঘরের ছেলে ; দেখিতে অতি সুন্দর ; তিন ভাই, ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ ; শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ; দাবী দাওয়া বিশেষ কিছু করেন না। ইহার অধিক আর কিছু জানিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্য এই যে, আমার বিবাহের দিনে বৌদিদিকে একটুকু হাসিতে দেখিলাম না ; অধিকন্তু কয়েক বার গোপনে চক্ষের জল মুছিতে দেখিলাম। কেন ?—আমি মাতৃপিতৃহীনা, সেই ক্ষোভে বৌদিদির চক্ষে অশ্রু না কি ?

নিজে কাঁদিয়া বৌদিদিকে কাঁদাইয়া, অনেক বাদ্য, লোক ও আলোকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া আমি শ্বশুরবাড়ী গেলাম। আমার দুইজন যাতা সেখানে গৃহকর্ত্রী। প্রথম আনন্দোৎসবের গোলমাল মিটিয়া গেলে, শুনিলাম একজন প্রতিবেশিনী বড় যাকে বলিতেছেন "তা তোমাদের ছোট বৌ বেশ চাঁদপানা হয়েছে ; এখন শরতের মতি গতি ভাল হয়, তাহ'লেই ভাল, সকল দিক্ বজায় থাকে, কি বল ?" বড় যা' উত্তর করিলেন "তা নয় তো আবার কি ? শরৎ অমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে বলেই তো এত তাড়াতাড়ি বে দিলুম। মেয়েটী দেখতে যেমন সুন্দর, শুনেছি গুণেও তেমনি। তাই আমরা কিছু দাবী দাওয়া কল্লুম না ; কিন্তু ভাই, ছোট বৌয়ের কপালে কি আছে তা' ভগবানই জানেন।" এর পরে দুজনে কাণে কাণে কি কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"শরৎ" আমারই বরের নাম।—কিন্তু তিনিই কি "বিগ্‌ড়ে" গিয়াছেন ? "বিগ্‌ড়ে" গিয়াছেন কি করিয়া ? বৌদিদির সেই নীরব রোদনের কারণ এই নয় তো ? আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা অজানা আতঙ্ক প্রবেশ করিল।

(৩)

রাত্রিতে আমার ফুলশয্যা। যথানিয়মে আমাকে পুষ্পাভরণে সুবাসিত করিয়া, ফুলের বিছানায় শোয়াইয়া, ফুলের পাখায় বাতাস দিয়া, ঘরে আতর ও গোলাপ জলের ছড়াছড়ি করিয়া, পুরবাসিনীরা চলিয়া গেলেন। কি এক ভয় ও কৌতূহলে আমার বুকে ঢেউ খেলিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর জানালা দিয়া চাঁদের আলো হাসিতেছিল, আমের ডালে আধ-ঘুমন্ত কোকিল বড় মধুর রব তুলিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে স্বামী আমার সহিত প্রথম কথা কহিলেন ; বলিলেন "ও রকম ক'রে ঘোমটা টেনে রয়েছ কেন ? কথা বল না।" স্বর রুক্ষ।

আমি সত্য কথা বলিতেছি কবিকুল আর পতিব্রতা মহিলাকুল আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন। স্বামীর প্রথম কথা শুনিবামাত্র সেই "ফুলময় ঘর" যেন শুকাইয়া গেল, চাঁদের আলো যেন মধুরতা হারাইল, কোকিল যেন "কুহু" ছাড়িয়া "উহু" রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমার মনে যে কি একটা ভয় করিতেছিল, সেইটা প্রবল হইয়া

উঠিল। সেই সঙ্গে আমার বৌদিদির স্নেহ ও আদরমাখা কথাগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল। সেই স্নেহময়ীকে মনে হইয়া আমার চোখে জল আসিল, আমি স্বামীর কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

বিরক্তির স্বরে স্বামী আবার বলিলেন "তুমি কথা শোন না কেন?—তোমার নাম কি বল না?"

আমি চোখ মুছিলাম; ঘোমটা একটু খাটো করিলাম; তার পরে ঢোক গিলিয়া উত্তর করিলাম, "আমার নাম শান্তি"—গলার স্বর কেমন জড়াইয়া গেল।

একটু প্রসন্ন ভাবে স্বামী বলিলেন "আচ্ছা বেশ। তা' তোমার গলায় হার দেখছি, ঐটা আমার হাতে দাও দেখি।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে দাদার প্রদত্ত পাঁচ ভরির হেঁসো হার খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি হার হাতে করিয়া আলোর কাছে গিয়া উত্তমরূপে দেখিতেছেন, এমন সময়ে দরজার কাছে কাহার সাড়া পাইলেন। দরজা বন্ধ ছিল; তিনি ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে এলি, শশী না যদু?" উত্তর হইল "দুজনেই এসেছি।" তিনিও আনন্দোৎসাহে বলিলেন "বেশ বেশ! আমিও খুব এক হাত মেরেছি।" এই কথার পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শুন শান্তি! তোমার নিজের জীবনের উপরে যদি মমতা থাকে, তবে কাল যখন বৌঠাকরুণরা জিজ্ঞাসা কোর্বেন 'তোমার হার কি হল?', তুমি বোলবে যে 'হারিয়ে গিয়েছে।' আমি হার নিয়েছি, এ কথা যদি কারো কাছে বল, তবে নিশ্চিত বোলছি, একটা কিলে তোমায় মেরে ফেলবো। আর এখন তুমি ঘুমিয়ে থা'ক, আমি আসছি।" এই কথার পরে তিনি দরজা খুলিয়া সেই দুইটী লোকের সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন।

বলিতে কি, তাঁহার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তিনি যে একজন ভয়ানক লোক, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার সহিত চিরকাল আমার গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, কোন্ দিন কোন্ ত্রুটি হইবে, আর তাঁহারই হস্তে আমার জীবন সমাপ্ত হইবে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল! বাবা গো! আমি তোমার অত আদরের মেয়ে, আমার অদৃষ্টের পরিণাম এই হইল? দাদা! তুমি এ কি করিলে? আমাকে কি রকম পাত্রে সঁপিয়া দিলে? তা' তুমি কি করিবে?—হা হিন্দুসমাজ! তোমায় আর কি বলিব! আমার দাদার টাকা নাই, তাই আমার কপালে সুপাত্র জুটিল না! সমাজ আমাকে কুমারী থাকিতেও দিল না!

দুঃখে, ভয়ে এবং নানা আশঙ্কায় জীবন্মৃতারূপে সেই ফুলশয্যার রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলাম। বঙ্গ রমণীর ভাগ্য! তোমাকে সহস্র ধিক্কার!

(৪)

মানুষের দিন যেমন করিয়া যাউক না কেন, প্রকৃতি মাতা যথানিয়মে কাজ করিতেছেন। চিরদিনের মত আজিও উষার পবিত্র শুভ্রালোক জগতে হাসিল; পাখীরা আবার তেমনি করিয়া মধুর কাকলি শুনাইল, বাতাস আবার তেমনি ঝির ঝির করিয়া বহিল; আমার সেই ফুলশয্যার ঘরে সরলা, চপলা, সরোজা, নীরজা প্রভৃতি কিশোরীগণের হাসিমাখা মুখগুলি একে একে প্রবেশ করিতে লাগিল, আমার মেজ যা' সকলের অগ্রবর্ত্তিনী।

ঘরে আমাকে একা দেখিয়া সকলে বিস্মিতা হইলেন। আমার মেজ যা' জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর পো কোথায় গেল?" আমি কোন কথা কহিলাম না, দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, স্বামী প্রাতঃক্রিয়ার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। তখন সকলে আমাকে ঘেরিয়া বসিয়া, রাত্রিতে স্বামীর সহিত আমার কি আলাপ হইয়াছে, সেই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

আমার মাথামুণ্ড আমি বলিব কি? যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলে বলিতে হয় যে "প্রথমে দু'একটী শক্ত কথার পরে আমার গলার হার লইয়া তিনি রাত্রিতেই কোথায় চম্পট দিয়াছেন!" কিন্তু ছি ছি, এমন ক্ষোভের কথা, এমন লজ্জার কথা এবং এমন অপমানের কথা এই সব সৌভাগ্যবতীদিগের সাক্ষাতে—তা আমি মরিলেও বলিতে পারিব না। আমি কোন্ পোড়ামুখে বলিব যে, হতভাগিনী আমি সমস্ত জীবন—জীবনের সমস্ত জিনিস যাঁহার চরণে দিতে আসিয়াছিলাম, তিনি আমার কিছুই লইলেন না; জগতের ধূলি-কণার মত, ভস্মকণার মত আমাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া গেলেন! হায়! আমার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে কি আমার কপালে এমনটা ঘটিত? আমার চক্ষের জল গালে গড়াইয়া পড়িল। আমি অধোমুখে আঁচলের কোণ পাকাইতে লাগিলাম।

এদিকে শত শত প্রশ্নের কোনও উত্তর না পাইয়া সুন্দরীরা আমার উপরে বড়ই বিরক্ত হইলেন। তখন "এ বউ সোজা মেয়ে নয়; ওঃ এমন চাপা মেয়ে তো দেখি নাই; সুরেশ দা'র স্ত্রীর মনটা যেন দুধের মত সাদা; রাঙা কাকীর মনের ভিতরে এমন কোন কথা নাই যে আমার কাছে বলে না, ও মা গো! ধেড়ে মেয়ে কাঁদ্‌ছে কেন? মা নাই, বাপ নাই, তবে কান্না কিসের জন্য?" সকলে এই রকম বলাবলি করিতে লাগিলেন—আমি সত্য কথা বলিব, তাঁহাদের কথাগুলি বড় তীব্র, সে যথার্থ; কিন্তু সর্পদিষ্ট ব্যক্তির যেমন বন্ধন-যন্ত্রণায় অধিক ক্লেশ অনুভূত হয় না, তাঁহাদের বাক্যবাণে আমার এ দারুণ-ব্যথিত হৃদয়ও সেই রকম বড় অধিক ব্যথা অনুভব করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ এ রকম অবস্থায় আমাকে থাকিতে হইল না। আমার বড় যা' সেই

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স ত্রিশের উপরে; তিনি বাটীর গৃহিণী, সকলের মাননীয়া। তাঁহার আগমন মাত্র কিশোরীকুল হাসি কথা সংযত করিয়া "ভালমানুষ" হইয়া বসিল। তিনি কোন দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন "মেজ বৌ! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে; তোরা সব ও ঘরে যা।"

আর সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমরা তিন যা' সেই ঘরের মধ্যে রহিলাম।

তখন বড় যা' অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "মেজ বৌ! শরৎ সর্ব্বনাশ কোল্লে! কা'ল সমস্ত রাত্রি ইয়ারদের সঙ্গে মিশে নেশা করেছিল। আজ ভোরে তা'কে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। এখন উনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন; বোল্‌ছেন 'হয় শরৎ মরুক, না হয় আমি মরি; নিত্য নিত্য এমন কেলেঙ্কারি আর সহ্য হয় না।' তা' শরৎকে তো অনেক দিন টাকা কড়ি দেওয়া হয় না; সে টাকা পেলে কোথা? তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে না কি মেজ বৌ?" মেজ যা' সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন "না দিদি, আমি তো ঠাকুর পোকে টাকা কড়ি দিই নাই।" তখন বড় যা' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোট বৌ! তুমি কি শরৎকে টাকা দিয়েছ?" আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম "না।"

তখন উৎসুকনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বড় যা' দেখিলেন আমার গলায় হার নাই। অমনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার হার কোথায় ছোট বৌ?" আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; জ্ঞান হইয়া আর মিছা কথা বলি নাই, আজিও বলিতে পারিলাম না। মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম। বড় যা' ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন "এই তো! ছোট বৌয়ের গলার হার কেড়ে নিয়ে আমাদের মুখে আগুন দেওয়া হোচ্ছে, আর ইয়ারদের পিণ্ডদান কোচ্চেন।"

মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়ীর সকলেই হারের কথা শুনিলেন। ভাশুর খুব কঠিন ভাষায় তাঁহার কনিষ্ঠের উদ্দেশে গালি দিতে লাগিলেন। আমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; আমি যাহা দেখিলাম শুনিলাম, তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কথা বলিবারও প্রবৃত্তি হইল না।

(৫)

আমার মেজ ভাশুর অনেক চেষ্টায় পুলিসের হস্ত হইতে আমার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী আনিলেন। তিনি বাড়ী আসিলে বড় ভাশুর তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন—এমন কি প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সঙ্গে আমার হার কাড়িয়া লওয়ার কথাও উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন।

বড় ভাশুরের কৃত সকল নির্য্যাতন তিনি সহ্য করিলেন বটে, কিন্তু আরে সর্ব্বনাশ! বাড়ীর ভিতরে যে রক

ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন, আজি পর্য্যন্ত তাহা মনে হইলে আমার চৈতন্য লোপ হয়। বিকৃতকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "বো' ঠা'ন্! তোমার পায়ে পড়ি, সেই রাক্ষসীটাকে বের করে দাও, সেই আমার নামে এত কলঙ্ক রটনা করেছে, আমি তা'কে খুন ক'রে সকল আপদ চুকিয়ে ফেলি।"

বড় যা' তাঁকে লইয়া খুব ঝগড়া করিলেন। আমাকে পাছে তিনি হত্যা করেন, এই ভয়ে মেজযা'র ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিলেন। স্বামী অনেক চেষ্টাতেও আমাকে না পাইয়া শেষে বড় যা'কে বলিলেন "আচ্ছা বো'ঠান! তুমি কত দিন তাকে বাঁচাবে? আমার হাতে ওর মৃত্যু নিশ্চিত লেখা আছে!"

আমার বৌভাত প্রভৃতি আর কিছুই হইল না। তিন দিন মাত্র সেখানে ছিলাম, স্বামীর ছায়াটীও আর দেখিলাম না। তিন দিনের পরে তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এ সংসারে ব্যথিত হৃদয় সহানুভূতি অন্বেষণ করে, কেননা সহানুভূতি পাইলেই ব্যথিত হৃদয়ে আরাম বোধ হয়। ইহা নর মানবের একপ্রকার স্বার্থপরতা কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ব্যথার সময়ে ব্যথার ব্যথী না পাইলে দিন যায় না। আমি বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার বালিকা-হৃদয়ের এই অসহনীয় যন্ত্রণারাশি, আমার সেই সুখদুঃখে চির অনুকূলা, সকল অবস্থায় প্রসন্নময়ী বৌদিদির প্রাণে ঢালিয়া দিব; তাঁহার স্নেহে—তাঁহার আদরে বুঝি এ জ্বালা অনেক জুড়াইবে।

হায়! যেমনটী ভাবিয়াছিলাম, তেমনটী কিছুই হইল না। আসিয়া দেখিলাম প্রবল জ্বরে বৌদিদি শয্যাগতা। দাদা সকল কাজ ছাড়িয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

আমি বৌদিদির অত বড় জ্বর আর কখনও দেখি নাই। তাই প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। নিজের সকল কষ্টের কথা ভুলিয়া গেলাম। বৌদিদির পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম, আর চক্ষের জলে মুখ ভাসিতে লাগিল।

রোগক্লিষ্টা স্নেহময়ী আমাকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইলেন। খুব আদর করিয়া বলিলেন, "কেঁদো না বোন, আমি ভাল হব।"

সেই হইতে আমি দিন রাত্রি বৌদিদির শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলাম। স্বামীর বিষয় চিন্তা করিবার বড় একটা অবসর রহিল না।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বিংশ জাতীয় মহামেলার (কংগ্রেস) কার্য্য বোম্বাই নগরে ২৬এ হইতে ২৯এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পুরুষ প্রতিনিধি ৯০০ এবং স্ত্রী প্রতিনিধি ২০ জন উপস্থিত হন। দর্শক ১০ হাজারের অধিক হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহিলা দুই শত। অনেকগুলি ওজস্বিনী বক্তৃতাসহ ১৯টী নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ফিরোজ সা মেটা এবং কনগ্রেস সভাপতি সার হেনরী কটনের বক্তৃতা অতি সারগর্ভ। সামাজিক সমিতি, স্ত্রী-সমিতি, ব্রাহ্মসম্মিলন প্রভৃতি কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরদা মহারাজ সামাজিক সমিতিতে অভিজ্ঞতাপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২। গত ১লা জানুয়ারী রুসবীর ষ্টেসেল নিরুপায় হইয়া পোর্ট আর্থার জাপান-হস্তে সমর্পণ করেন। জাপান সেনাধ্যক্ষ নগি দুই এক দিনের পরে বহুসংখ্যক কামান ও গোলাগুলির সহিত বন্দরটী অধিকার করিয়াছেন। তিনি শত্রুদিগের প্রতি যে সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সভ্যজাতির দৃষ্টান্তস্থল।

৩। এবারকার কংগ্রেসের সভাপতি সার হেনরী কটন্ কলিকাতায় আসিয়া শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। কলিকাতা টাউনহলে মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ধুবড়ি ও গৌহাটিতে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আসামবাসিগণ মহোৎসাহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

৪। লর্ড কর্জন এবং সার এণ্ড্রু ফ্রেজার সার হেনরী কটনকে আপন আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিণ্ডিকেট বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এইরূপে গঠিত হইয়াছে :—

আর্টস প্রতিনিধি—মেং ওয়ান, মেং হুইলার, মেং রসেল।

বিজ্ঞান প্রতিনিধি—মেং কুচলার ও উড।

আইন প্রতিনিধি—জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র।

চিকিৎসা প্রতিনিধি—ডরি, কর্ণেল হারিস।

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিনিধি—মেং ম্যাকডোনেল।

৬। গত ৩০ এ ডিসেম্বরে লণ্ডনে মহা ঝড় হইয়া অনেক গৃহ নষ্ট করিয়াছে।

৭। ত্রিপুরার মহারাজা চট্টগ্রামের হাঁসপাতাল ও পানীয় জলের সাহায্যার্থ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বামারচনা।

পিতৃপূজা।

পিতঃ!
আমি ত রমণী ক্ষুদ্র
কি বুঝিব মহিমা তোমার ;
সাকার যে ভগবান্
প্রত্যক্ষে তা জেনেছি এবার।
জগতে কে হেন পূজ্য
মহত্তর পিতার সমান ?
পিতৃনামে তাই নর
ভক্তিভরে পূজে ভগবান্।
দেখেছি কৃপায় তব,
জনমিয়া—শোভার আগার,—
শ্যামলা এ বসুন্ধরা,
বিচিত্র এ সুন্দর সংসার।
শুনেছি তোমারি স্নেহে,
জগতের সুখময় গীতি ;
তোমারি চরণতলে,
শিখিয়াছি জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি।
সংসারের কঠোরতা
ভেঙ্গে দে'ছে যবে এ হৃদয়,
অতুল মমতা দিয়ে,
জীবন করেছ সুখময়।
জনক জননীরূপে,
মূর্ত্তিমান্ জগতে ঈশ্বর।
এ স্নেহের সমতুল,
বিশ্বে আর কি আছে সুন্দর ?
বুঝিয়াছি পিতৃসত্যে
রাম কেন গেছিলেন বন,
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে গেল
নচিকেতা যমের ভবন।
আমি ত অধম দেব!
পিতৃপূজা জানি না কেমন,
ভক্তিটুকু দিয়ে শুধু,
জানি মাত্র পূজিতে চরণ।
সংসারের কোলাহলে,
ভুলি যদি কর্ত্তব্য আপন,
পদধূলি দিয়ে পিতঃ,
ভ্রান্তি দূর করিও তখন।
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম,
পিতৃপূজা প্রীতিতে পিতার,
সার্থক জীবন লয়ে
হয় নর প্রিয় দেবতার।

শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ধ্যান।

ফুটে না কুসুম ছুটে না বাস,
মলিন বয়ান—প্রাণ উদাস।
সুপ্ত আঁখি দুটি ধ্যানমগন,
বায়ু বহে হের শুভ লগন।
অগুরু চন্দন পুষ্পসম্ভার,
ধূপ দীপ মালা নানা উপচার।
করে না করে না সেথায় উজল,
নীরব নিথর নাই কোলাহল।

আবরিয়া আছে মরমতল,
(কাহার) ভাবনার রাশি অনল।
উথলে উৎস ভেদি হৃদি বক্ষ,
ঝরে শতধা' প্লাবি আঁখি কক্ষ।
স্নিগ্ধ নীরে ধৌত পঙ্করাশি,
স্বচ্ছ নিরমল অকলঙ্ক শশী।
উজল চাঁদিমা উঠিল বিকাশি,
জ্যোতির্ম্ময় দেব ধ্যানে আছে
পশি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

"শোকোচ্ছ্বাস।"

ক'দিনের তরে এসেছিলি ভাই,
আজি নাকি আর এ জগতে নাই ?
তুইরে সোণার মেয়ে।
কবিতা-মাখান কত হাসি গান,
ঘিরেছিল রাণী তোর কচি প্রাণ।
নয়নের পরে কত আশা তোর,
প্রাণের ভগিনী সুহাসিনী মোর।
মরণের পারে অমৃতের দেশে,
চলে গেছে রাণী অমরীর বেশে।
ক্ষুদ্র শিশুগুলি "জনক" "জননী"
কত হাহাকার করিতেছে রাণী।
স্বরগ আসন হতে এস তুমি একবার,
মুছাইতে শোক-অশ্রু, থামাইতে
হাহাকার।

শ্রীমতী সরলা দত্ত।

আমরা কটি।

আমরা সাতটি
চার বোন তিন ভাই
হাসি খেলি গান গাই,
মিলে মিশে থাকি সদা আমরা সকলে,
সুখে দুখে থাকি মোরা সাতটিতে মিলে।১

সকলের বড় ছিল "বিনয়ভূষণ,"
তাঁহারে লয়েছে হরে দুরন্ত শমন।
নিদারুণ প্লীহারোগে
গেছেন স্বরগ লোকে
পিতা মাতা আত্মীয়ের ভেঙ্গে দিয়ে বুক,
জানিনা সেথানে তাঁর কেমন যে সুখ।২

এখন "সুনীতিবালা" বড় সকলের,
আমরা বোন ও ভাই তাঁহার স্নেহের,
স্নেহময়ী দিদি মম,
স্বরগের দেবীসম,
হৃদয়তে পুরা আছে স্নেহ নিরমল,
সে স্নেহেতে ডুবে মোরা ভাই-বোন-দল।৩

মধ্যমা "সুরুচিবালা" আমি সেই জন,
আমার নীচেতে ভাই "অমিয়ভূষণ।"
মোহন মূরতিখানি
সরলতা মাখা জানি,
বিমল সুন্দর মুখে মধু হাসিরাশি
সদা দেখিবারে আমি বড় ভালবাসি।৪

অমিয়ের নীচে "মণি" প্রাণাধিক মম,
তাহার মূরতিখানি দিব্য অনুপম,

সাত বছরের ভাই,
কোলে লই চুমা খাই,
হৃদয়ে চাপিয়া ধরি মনের আবেগে,
কভু গালে চড় মারি স্নেহের সোহাগে।৫
তার পর একবোন "প্রভাতী" আমার,
তা'পর "বসুধা" মম স্নেহ-পারাবার
"জিনিয়া"* তাহার পর
গোলাপ বেলীর স্তর,
কেবল গোলাপ কলি উঠিতেছে ফুটি;
আমরা সাতটি এবে আমরা সাতটি।৬

অম্বুজাসুন্দরী যিনি জননী মোদের।
তাঁর পদে নমস্কার
করিতেছি বার বার,
জীবন্ত স্নেহের দেবী প্রতিমা ধর্ম্মের।

কুমারী সুরুচিবালা।

* জিনিয়া কুসুম।

প্রার্থনা।

দেবতা, তোমার চরণতলে
দিয়াছি ঢালিয়া আমার সব ;
শুনাও মোরে দিবস রাতি
তোমার মধুর বাঁশীর রব।
আমি,—মুগ্ধা কুরঙ্গিণী প্রায়—
অবসন্ন দুটি নয়ন মেলি
চাহিয়া রব তোমার পানে,
চাহিয়া রব সকলি ভুলি।১।

পূরব গগনে রক্তিম ছটা,
দেবতা, যখন উঠ্‌বে ফুটি,
ফুলের বনে ফুটন্ত ফুলের
সমীর বেড়াবে সৌরভ লুটি,
যখন মধুর প্রভাতকালে
গাহিবে পাখী মধুর গান,
তখন দেবতা বাঁশীর স্বরে
মোহিত করিও আমার প্রাণ।২।

মধ্যাহ্নে যখন রবির করে
তাপিত হবে এ ধরণীতল,
সারাটী জগৎ নীরব হবে,
থাকুবে না একটু কোলাহল,
দেবতা, তখন মধুর হাসি
আনিও তোমার মধুর মুখে,
চাহিয়া থাকিব মুখের পানে
ভুলিয়া আমার সকল দুখে।৩।

সাঁঝের বেলা পশ্চিম-আকাশ
রক্তরাগে যবে উঠ্‌বে ফুটি,
লতায় পাতায় ফুলের মুখে
মধুর হাসি পড়্‌বে লুটি ;
এ বিশ্ব জগৎ শান্ত হইবে,
থেমে যাবে বিহগ-কোলাহল,
সাগর মাঝে জলের রাশি
গরজিবে শুধু কলকল ;
ঘুমেতে নয়ন আস্‌বে মুদি,
ঢলে পড়্‌ব ঐ চরণতলে ;
দেবতা, তখন করুণা করে
তুলে নিও মোরে অভয় কোলে।৪।

চামেলী।

স্বর্গগত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ভারত ধর্ম্মজগতের উজ্জ্বল রবি ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রিয় মাঘোৎ-সবের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে গত ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ১টা ৫৫ মিনিটের সময় তাঁহার উদয়-স্থল যোড়া-সাঁকো ভবনেই অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর ৮ মাস হইয়া-ছিল। এই সুদীর্ঘ জীবনে সাধন-সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস-পানে তিনি জীবন্মুক্ত ভক্তসেবক হইয়া-ছিলেন এবং তাঁহার তপস্যালব্ধ পুণ্যফল বিতরণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র নর নারীর আত্মার মুক্তির সহায়তা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবন এই মনুষ্য-লোকে আদর্শ দেবজীবন। তিনি যেমন প্রেমময় ঈশ্বরের গভীর প্রেমে ডুবিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্ম-প্রীতিকাম হইয়া আপনার প্রাণ মন ও অর্থ সামর্থ্য তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনে উৎসর্গ করিয়া জগতের হিতব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আদর্শ মহাপুরুষের জীবন ধর্ম্মজগতের সাধারণ সম্পত্তি এবং জাতীয় মহাসম্পত্তি। ইঁহার বিয়োগে কেবল ইঁহার পুত্রকন্যাগণ পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় নন—কিন্তু ইঁহার উদার হৃদয়ের স্নেহা-শ্রিত এবং গুরূপদেশে উপকৃত শত-সহস্র ব্যক্তি আজি সেই অবস্থাপন্ন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পূর্ণমঙ্গল পরমপিতা পরব্রহ্মের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার এই সাধুসন্তানকে অমরলোকে দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করুন এবং তাঁহার অনন্ত সুধাসাগরে নিমগ্ন করিয়া সেই মহা-প্রাণের অনন্ত আশা পূর্ণ করুন। আত্মীয় পরিজন তাঁহার বিয়োগে আজি যাঁহারা শোকাকুল, শান্তিদাতা তাঁহাদিগের প্রাণে শান্তি দিউন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহার ন্যায় সকলে যাহাতে শান্তি-নিকেতনে স্থান লাভ করিতে পারেন, এমন আশীর্ব্বাদ করুন। এই মহাজীবনের আদর্শে দেশবাসিগণও যাহাতে মহত্ত্ব ও দেবত্ব উপার্জ্জন করিতে পারেন, মহান্ পরমেশ্বর তাহারও সহায়তা বিধান করুন।

বামাবোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যার মুদ্রাঙ্কন শেষ হইবার সময় এই শোক-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে হইল, এজন্য মহর্ষির মহৎজীবনের বিশেষ বিবরণ দিবার কিছুই অবসর হইল না, পরে তাহা প্রকাশিত হইবে। তাঁহার আত্মরচিত জীবনী কিছু দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা এক খানি মহামূল্য গ্রন্থ; তাহা হইতে তাঁহার জীবনের গূঢ় তত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে ভগবানের আশ্চর্য্য জীবন্ত লীলা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তিনি আপনার লেখনীতে আপনার মহৎকার্য্যের এবং চরিত্রমাহাত্ম্যের পরিচয় দেন নাই, বিশেষতঃ এ জীবনী তাঁহার জীবনের আংশিক চিত্র মাত্র। শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জীবনী পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত

হইলে তাহা অমূল্য, অতুল্য ও অত্যুপাদেয় সামগ্রী হইবে।

শ্রীমন্মহর্ষি একাধারে "আমীর ও ফকির" ছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে ধন জন সুখসম্পদে সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, আজন্ম সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত। তাঁহার সাতপুত্র ও তিন কন্যা, ইঁহাদের মধ্যে দুইটী মাত্র তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোকগত হন। তিনি শতাধিক-বংশধরগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং চারি পাঁচ পুরুষ দর্শনের সুখলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং কন্যাদিগের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর নাম কে না জানেন? বিদ্যাবত্তা, কৃতিত্ব, ধর্ম্মানুরাগ এবং দেশহিতৈষিতায় তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ। এই ঠাকুর পরিবার কলিকাতার ধনাঢ্য জমিদার পরিবারের অন্যতম বলিয়া গণনীয়। কিন্তু এই সকলের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় পাহাড় পর্ব্বতে নদী সমুদ্রে নির্জ্জন ধ্যান ধারণা ও তপস্যায় গত হইয়াছে এবং তাঁহার হস্তে যে অর্থ আসিয়াছে, তিনি তাহা মুক্তহস্তে জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছেন। জীবনের এমন ক্লেশ নাই, যাহা তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বহন না করিয়াছেন। শেষ জীবনে বহুবৎসর এক-প্রকার চক্ষুকর্ণবিহীন ও বিবিধ উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন, তথাপি ইন্দ্রিয়াতীত সংসারাতীত পরম জ্যোতি হৃদয়ে লইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত ও মুখের অমৃতময় উপদেশে বিষয়ীদিগকে প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীমন্মহর্ষির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রাজযোগ্য হইয়াছে। তাঁহার স্বর্গগমনান্তে তাঁহার পবিত্রদেহ ঋষিবেশে সজ্জিত ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া পল্যঙ্কসহ রাজপথ দিয়া নিমতলায় শ্মশানক্ষেত্রে নীত হয়। তাঁহার আত্মীয় স্বজন যেমন, অন্য ব্রহ্মোপাসকগণও তেমনি এই শবাধার বহন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিয়াছেন। সহস্রলোক অনুযাত্রী, ইঁহার সম্মানার্থ ঘাটে পথে বহুলোক দর্শনার্থী হইয়া সম্মিলিত। ঠাকুরবংশের অগ্রগণ্য সার মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর স্বগণ লইয়া শ্মশান-ক্ষেত্রে উপনীত। যোড়াসাঁকোগৃহে ঈশ্বরের নিকট সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এই মহাবাক্য আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রাহ্মগণ মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। কেবলমাত্র চন্দনকাষ্ঠ-স্তূপে চিতা সজ্জিত হয় এবং সুগন্ধদ্রব্যসহ ভারে ভারে ঘৃত তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হয়। তাঁহার স্বপ্রণীত পদ্ধতি অনুসারে বৈদিকমন্ত্রসহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ অগ্নিদান করেন। ২ ঘন্টার মধ্যে দেবদেহ ভস্মে পরিণত হইল। মৃত্যু স্বীয় অধিকারভুক্ত নশ্বর ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিল, কিন্তু দেবাত্মা মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অমরধামে বিরাজমান!! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

৪৩৬ বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 498. February, 1905.

BAMABODHINI PATRICA,

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৪৯৮ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩১১। ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫।	৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মৃত্যু—(১) আমরা গভীর হৃদয়-বেদনার সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পরমাত্মীয় এবং বামা-বোধিনীর প্রবীণ লেখক বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু গত ১৩ই মাঘ কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সুকবি, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রায় ৩০ বৎসরকাল বিবিধ প্রবন্ধ দ্বারা বামাবোধিনীকে অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাঁকে হারাইয়া বামাবোধিনী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিশ্ববিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান এবং ৫টী পিতৃশোকাকুল পুত্রের সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করুন।

(২) মূকবধির বিদ্যালয়ের জন্ম-দাতা বাবু শ্রীনাথ সিংহ গত ১১ই মাঘ বৃদ্ধ মাতা, পত্নী ও কন্যাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অকাল-বিয়োগে আমরা শোকার্ত্ত এবং বিদ্যালয়টী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। বিদ্যা-লয়ের নবগৃহ প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার অকালমৃত্যু "হরিষে ঘন বিষাদ!!" জগদীশ্বর ইহাঁর আত্মার সদ্গতি-বিধান করুন এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

মাঘোৎসব—৭৫ সাংবৎসরিক মাঘোৎ-সব তিন সমাজেই অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীমদ্ধরি

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের তিরোধানে একটী শোকের ছায়া ব্রাহ্মসমাজকে আচ্ছাদন করিয়াছে। তাহাদ্বারা পবিত্র ব্রহ্ম-জ্যোতিকে আরও উজ্জল করিয়া দিয়াছে এবং ইহপরলোকের সংযোগে ব্রহ্মোৎসব পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে।

রাজ-সমাগম—লর্ড কর্জনের আহ্বানে কলিকাতার গোয়ালিয়ার, জয়পুর, মহীশূর প্রভৃতির মহারাজগণ একত্র হইয়া ব্রিটিষ রাজ-গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

রুসিয়ার মহাবিপদ্—একদিকে বহিঃশত্রু জাপান রুস-হস্তীকে আঘাতে আঘাতে অস্থির করিয়াছে; অন্যদিকে প্রজাগণ অন্তঃশত্রু হইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিতেছে। সেন্টপিটার্সবর্গ, মস্কৌ, ওয়ার্সা, প্রভৃতি নগরে ঘোর প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত।

বোম্বাই-প্রদর্শনী—ডিসেম্বরে আরম্ভ হইয়া ৬ই ফেব্রুয়ারিতে শেষ হইয়াছে। এ অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের ছোট লাট—সার এচ এস বর্ণেল বাহাদুরের স্থানে সার হার্বার্ট মার্কল হোয়াইট ব্রহ্মের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইনি তত্রত্য হাইকোর্টের প্রধান জজ ছিলেন।

রেলওয়ের নূতন উন্নতি—ছোট লাট ফ্রেজার বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে খুলিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার এবং গোয়ালন্দে শুক্রবার রিটর্ণ টিকিট লইয়া সোমবার ফেরা যায়। মাশুল অর্দ্ধেকের কম হইয়াছে।

লেডী কর্জনের আরোগ্যলাভ—অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় বড়লাট-পত্নী ১৮ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ড হইতে ভারতযাত্রা করিয়া মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন। ডাক্তারেরা সমুদ্রের জলবায়ু তাঁহার পক্ষে অনুকূল বলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-বিভ্রাট—বোম্বাই ও কলিকাতায় যে সিণ্ডিকেট নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা বে-আইনী বলিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে এবং কলিকাতা সিণ্ডিকেটের স্থলে ১৩ জন সভ্যের এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

পলাসী যুদ্ধক্ষেত্র—পলাসী যুদ্ধের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতি-সংরক্ষক লর্ড কর্জন এই যুদ্ধ-ক্ষেত্র স্বয়ং দর্শন করিলেন। এখানে কোনও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন আবশ্যক।

রুষ জাপযুদ্ধ—গত ২৯ এ জানুয়ারি রুসদিগকে হটাইয়া দিয়া জাপেরা হিকটছি দখল করিয়াছে। এই যুদ্ধে জাপপক্ষে ৭০০০ এবং রুষপক্ষে ১০,০০০ সৈন্য হত হইয়াছে।

প্রাচীন কাহিনী—মতিলাল শীল।

স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহোদয় অতিশয় সুহৃদয় পরদুঃখকাতর ছিলেন। তিনি নিজ-জীবনে যৌবনের প্রারম্ভে নিতান্ত দীন দুঃখীর ন্যায় জীবন-সংগ্রামের সূচনা করেন। সামান্য অর্থ লইয়া সামান্য লোকের ন্যায় এই কলিকাতা নগরীতে ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করেন, সে আজ প্রায় এক শত বৎসরের কথা। কিন্তু শ্রমশীলতা ও নিষ্ঠার গুণে ক্রমে ক্রমে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সময়ে তিনি এত বড় লোক হইয়াছিলেন যে, যখন সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব সংবাদপত্রসমূহে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন তিনি কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করিবেন, তিনি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ উপহার দিবেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত প্রথম বিধবাবিবাহের সময়ে এই দানবীর লোকান্তরিত হন। তিনি জীবিত থাকিলে বিধবা-বিবাহের প্রথম বর ৺শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অবশ্যই এই এক লক্ষ টাকা যৌতুক পাইতেন।

স্বর্গীয় শীল মহাশয়ের কথায় এবং কার্য্যে এক বিন্দু পার্থক্য ছিল না। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন। তিনি তাঁহার সময়ের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কর্ম্মবীর বলিয়া অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিপুল ধনরাশির অধিকাংশ তিনি সাধারণ হিতানুষ্ঠানে ও ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীকরণে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার নিজ হস্তে দেওয়া দানের তালিকা বা উপাখ্যান সংগৃহীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইলেও, তাঁহার এরূপ দানের আংশিক বিবরণ সংগৃহীত ও প্রচারিত হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত একটি বৃহৎ কার্য্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতকর্ম্মা পুরুষ, স্বর্গীয় মতিলাল শীল তাঁহাদের অগ্রগণ্য। ইঁহার কার্য্যকলাপ সর্ব্বথা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। তাঁহার বংশধরগণের হস্তে পড়িয়া ভবিষ্যতে পাছে তাঁহার অভিপ্রেত অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটে, এজন্য তিনি তাঁহার কয়েকটী স্থায়ী কার্য্যের এরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা কোনও কালে লোপ পাইবে না। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে বন-হুগলীর অতিথিশালা, শীল্‌স ফ্রি কলেজ এবং ভদ্র পরিবারের অসহায়া বিধবাগণের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক দান।

আমরা আজ কেবল এই বৃহৎ দানশীলতার শেষাংশের কিঞ্চিৎ আলোচনা

করিব। অনেকের না হইলেও অন্ত কোন কোন মহানুভব ব্যক্তির এরূপ কিছু কিছু দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সে সকলের অনেক স্থলেই তাঁহার আপন আপন জাতীয় অসহায়া স্ত্রীলোকগণের আংশিক সাহায্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মতিলাল শীলের দান-তালিকায় জাতিগত কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, এবং তাঁহার প্রদত্ত এই মাসিক বৃত্তি দানের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত আছে, তাঁহাদের দ্বারাও স্বর্গীয় শীল মহোদয়ের ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সংপ্রতি আমাদের এই মাসিক বৃত্তি বিতরণ স্বচক্ষে দর্শন ঘটিয়াছিল। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও দাতার স্বজাতিনির্ব্বিশেষে কলিকাতায় অনেক বিধবা মাস মাস এই সাহায্য পাইতেছেন। দানের পরিমাণ ৩৲ টাকার ন্যূন নাই, এবং ৬৲ টাকার অধিক নহে। অবস্থানুসারে ৩৲, ৪৲, ৫৲, ৬৲ টাকার হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে।

মতিলাল শীলের মহদাত্মা বহুদিন হইল, ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এত দিন পরেও যে অর্জ্জিত অর্থে বিপন্না বিধবারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত, ইহা কি সেই মহাত্মার মহদন্তঃকরণের পরিচায়ক নহে? মতিলাল শীলকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনের হিসাবে মূর্খ লোক বলিতে অবশ্যই নব্যসম্প্রদায় কুণ্ঠা বোধ করিবেন না, কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দীর ১ম ভাগের মূর্খ শ্রেণীর মানুষটার প্রাণের বিশাল গভীরতা ও বিস্তৃতির নিকট এই বিংশ শতাব্দীর দিব্যোজ্জ্বল-জ্ঞানসম্পন্ন উন্নতমস্তক মনুষ্য-হৃদয় কি অকিঞ্চিৎকর বস্তু নহে? বলিতে লজ্জা হয়, এই পরলোকগত বেণের ছেলের অনুকরণ করিবার মত হৃদয় আজি কালিকার ধনী কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরেও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তা' দেখিতে পাইলে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম, এই রাজধানীর বড় বড় ব্রাহ্মণ কায়স্থ রাজা ও জমিদারের সখের বাগান বাড়ী অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছে; যে অর্থে ইংরাজের কৃপাদৃষ্টি ক্রয় করিতে হয়, তাহাতে শীল-কলেজের ন্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনাথ ও দরিদ্র বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান হইতেছে। নিঃসম্পর্কীয়া অনাথা বিধবাদের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয় স্বজনগণের অন্নাভাব ও তজ্জাত হাহাকারের মাঝখানে যে দেশে নৃত্য গীতের ফোয়ারা ও আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ উত্থিত হয়, সে দেশের লোকের নিকট এই বেণের ছেলে কি প্রাতঃস্মরণীয় নহে? পুণ্যশ্লোক কেবল নল রাজা নহেন, কেবল বৈদেহীও নহেন, অক্ষয়—অমর মতিলালও পুণ্যশ্লোক।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার অদৃষ্ট।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

আমার পিত্রালয়ে যাইবার চারি দিন পরে দাদার নামে এক টেলিগ্রাম আসিল। "টেলিগ্রাম" শুনিয়া আমি সন্ত্রস্তা হইয়া দাদার কাছে গেলাম। দেখি দাদার মুখ পাংশুবর্ণ! তাঁহার সমস্ত গা কাঁপিতেছে! ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে দাদা বিকৃতকণ্ঠে আমাকে বলিলেন, আমার বড়ভাশুর টেলিগ্রাম করিয়াছেন, গত রাত্রিতে আমার স্বামী একটা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়া অদ্য লজ্জাবশতঃ বন্দুকের গুলি খাইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন!

এ ঘটনা আমার কাণে কেমন শুনাইল, সহৃদয় পাঠক পাঠিকা তাহা অবশ্য বুঝিতেছেন। স্বামীর সহিত আমার আলাপ কিছুই নহে; তাঁহার চরিত্রের পরিচয় যতটুকু পাইয়াছি, তাহাও হৃদয়-বিদারক; কিন্তু তথাপি আমি হিন্দু-সমাজের মেয়ে; তথাপি আমি জগতের অভাগিনী বিধবা!

দুই ভাই ভগিনী অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পরে একটা কথা মনে পড়িয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। দাদার পায়ে হাত দিয়া বলিলাম, "যা হবার তা'তো হয়েছে; এখন দাদা এ কথা যেন বৌ দিদির কাণে না যায়।"

দাদার চক্ষে ধারা বহিল। আমাকে খুব কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শান্তি! তুইই ধন্যা! তোর ভাগ্যে যা' ছিল তা' হ'ল; এখন তুই যা' হাতে করে দিবি, আমরা তাই খাব।" আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বিধবা ভগিনি! তোমার যদি স্নেহময় ভ্রাতা থাকেন, তাঁহার যদি স-হৃদয়তা থাকে, তবে তাঁহার সহানুভূতি, তাঁহার অভয় আশ্রয়ে তোমার যে কত আরাম, তাহা মনে মনে অবশ্য বুঝিতেছ! কিন্তু বলিতে কি, বিধবার পোড়া কপালে সে আরামটুকু সহ্য হইলে হয়!

দুই ভাই ভগিনী ঘরে গিয়া দেখি বৌ দিদি প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দাদা তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন; একান্ত আকুল হইয়াও আমি কাঁদিলাম না। পাছে বৌদিদির কোনও অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে চক্ষের জল চাপিয়া রাখিলাম।

ডাক্তার আসিলেন; কোনও ভরসা দিলেন না। তার পরে আর কি বলিব? —পতিপ্রাণা সাধ্বী পতির পদধূলি মাথায় দিয়া, আমাকে দাদার হাতে হাতে সঁপিয়া জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তার পরে আর কি বলিব? আমার সেই "স্নেহে মাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী"—আমাদের সেই গৃহের লক্ষ্মী, সংসারে শান্তি, হৃদয়ের আনন্দ-রূপিণী বৌদিদি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া

গেলেন! আমি মাতৃস্নেহের মর্ম্ম বুঝি না, স্বামীর প্রণয় কি তাহা জানি না, বৌ-দিদি! তোমার স্নেহনীরে এ দগ্ধ জীবন নিরাপদে কাটাইব জানিতাম, এ অভাগিনীকে ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে? আর বাঁচিব কিসের জন্য?

ভ্রাতার গৃহই আমার একমাত্র আশ্রয়। বিবাহের কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বিধবা হওয়াতে শ্বশুর বাড়ীর সকলে "অপয়া মেয়ে" বলিয়া আমাকে একেবারে ত্যাগ করিলেন; দাদাই আমার জীবনের অবলম্বন।

বৌদিদির শোকস্মৃতি বক্ষে করিয়া যখন দুই বৎসর কাটাইলেন, তখন দাদার উদাসীন জীবনে আমার বুকে শেল বিঁধিলেও আমি মনে মনে বেশ একটু আরাম পাইতাম।

দুই বৎসর পরে যে দিন সন্ধ্যার সময়ে আমাকে ডাকিয়া দাদা বলিলেন "শান্তি! বন্ধুবান্ধব সকলেই বলিতেছেন আমি আবার বিবাহ না করিলে সংসার থাকিবে না; আমিও বুঝিতেছি তোমায় বড়ই খাটিতে হয়, তোমার একজন ভ্রাতৃজায়া আসিলে তোমাকে আমাকে যত্ন করিতে পারিবে," তখন—সত্য কথা বলিব—বৌ-দিদিকে মনে হইয়া আমার ভয়ানক কান্না আসিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম দাদা নিঃসন্তান, কেবল তেত্রিশ বৎসরে পা' দিয়াছেন, এ রকম অবস্থায় মৃত পত্নীর স্মৃতি লইয়া যে চিরকাল কাটাইবেন, সে হৃদয় পুরুষ মানুষের নহে; সে শক্তি পুরুষ মানুষের নাই।—ব্যক্তিবিশেষের কথা বলি না, সাধারণের কথাই বলিতেছি। যা হউক আমি দাদার কথায় উত্তর করিলাম "ভাল।"

আর কথাটী না বলিয়া দাদা বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিলেন। আমি বৌকে যথোচিত স্নেহ ও যত্ন করিলাম। কিন্তু আমার নিজের ঘরে যখন একা থাকি, তখনই বৌদিদির জন্য কাঁদিয়া মরি! দাদার মনের কথা কি তাহা জানি না, তবে বৌদিদির অপেক্ষা এ বৌকে তিনি একটু বেশী যত্ন করেন।

মেয়ের নাম নীরজা। আজি চারি বৎসর হইল নীরজা আমাদের ঘরে আসিয়াছেন। আমাকে দাদা স্নেহ মমতা করিলে অথবা কোনও কাজে আমাকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখিলে নীরজা বড়ই বিরক্ত হন। সময়ে সময়ে আমার নামে দাদার কাছে নিন্দা মন্দ করিতেও ত্রুটি করেন না। তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে, সেটীকে আমিই পালন করি। যে দিন আমার উপরে রাগ হয়, সে দিন বৌ খোকাকে আমার কাছে আসিতে দেয় না। আমি চোখের জলে বালিস ভিজাইয়া মরি।

কেন বালিস ভিজাইয়া মরি? হায়! হিন্দুসমাজ! ভগবান্ তোমাকে সব দিয়াছিলেন, কেবল হৃদয় দেন নাই! তাই আমার দাদা বহুকাল পর্য্যন্ত যে সহ-ধর্ম্মিণীর সহিত গৃহধর্ম্ম পালন করিলেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগে যাহাকে সহযোগিনী

করিলেন; দুই বৎসর পরে তাঁহাকে একটী বালিকাকে গ্রহণ করিতে তুমি প্রসন্নমুখে অনুমতি দিলে, আর আমাকে? আমি স্বামীর ভালবাসা পাইলাম না, স্বামীকে ভাল বাসিলাম না, দাম্পত্য ধর্ম্ম কি কিছুই জানিলাম না, অথচ সেই কুকর্ম্মাচারী, আত্মহত্যাকারী স্বামীর বিয়োগে বালিকা বয়সে হাতের বালা খুলিয়া, একবেলা খাইয়া, একাদশী করিয়া দিন কাটাইতেছি, আমাকে যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেছ! ধর্ম্মের নামে এই মহা অধর্ম্মাচরণ করিতেছ! হায়রে, এ সংসারে কেন আসিয়াছিলাম, সংসারে সাধ আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, জীবনের পরিচালক পাইলাম না, সুখদুঃখে সহযোগিতা করিতে কেহ আসিল না! কেহ আমাকে "আমারই" বলিয়া প্রাণের ভিতরে স্থান দিল না, আমিও কাহাকে "আমারই" জানিয়া পরিতৃপ্তা হইলাম না! এই হৃদয়-পূর্ণ প্রেমপিপাসা একদিনের জন্য নিবৃত্ত হইল না, সন্তান সন্ততির মা' হইয়া রমণী-জন্মের মহত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না, এই দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা বহিয়া যাইতেছে! নির্ম্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হিন্দুসমাজ! তুমিই আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছ! আমি কুমারী নাইটিঙ্গেল নহি, ভগিনী ডোরা নহি, ভগবদ্গীতার মানুষ নহি। পুরুষ! তোমরা যে উপাদানে গঠিত, আমিও তাই; তবে কোন্ অপরাধে আমি সকল সাধে বঞ্চিতা হইয়া রহিলাম? অবলার উপরে কি এমনই প্রভুত্ব করিতে হয়? এই কি পৌরুষ?

এ সংসারে আমার ছিল না কি? সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের যে রকম রূপ-গুণ বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, আমাতে তাহার ছিল না কি? স্বার্থপরতা-পূর্ণ ভ্রাতৃজায়ার পায়ে তেল দিয়া আমার সব আমি দুর্ভর বোঝার মত বহিয়া বেড়াইতেছি! আজি কোথায় তুমি—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর! তুমি আজি কোথায়? আজি কোথায় তুমি—অবলাবান্ধব কেশবচন্দ্র! তুমি আজি কোথায়? আজি কোথায় তুমি—নলডাঙ্গার রাজা প্রমথ-ভূষণ! আজি তুমি কোথায়? আর কোথায় তুমি কবিবর হেমচন্দ্র! তুমি গাহিয়াছিলে,

"পুরুষ দু'দিন পরে আবার বিবাহ করে,
রমণী অবলা বলে এত জ্বালা সয়রে!"

আজি তোমাদের নাম লইয়াও কৃত-কৃতার্থা হইতেছি। এই বাক্য-বিশারদ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তোমরা সত্যই আসিয়াছিলে, বালিকা বিধবাদের বিবাহের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে, এই সব হত-ভাগিনীদের জন্য সত্য সত্য তোমরা কাঁদিয়াছিলে, এ কথা মনে হইলে যেন সকল দুঃখ ভুলিয়া যাই। হে দয়াময় জগদীশ! আর কি তোমার সেই সব সুসন্তান জগতে আসিবেন না? এই স্বার্থপর সংসারে, এই প্রলোভনময় সংসারে, এই নিষ্ঠুরতাপূর্ণ সংসারে বিধবাদের মুখ পানে সেই স্নেহের চক্ষে

কি কেহ চাহিবে না? তবে মা বঙ্গভূমি! একবার ফাটিয়া দুইখানা হইয়া পড়, অভাগিনীরা তোমার ভিতরে লুকাইয়া থাকুক।

আমার অদৃষ্ট-কাহিনী শেষ করিলাম; যদি ইহা কেবল আমারই অদৃষ্ট হইত, তবে একরকম করিয়া সহিয়া সময়ে মরিয়া যাইতাম। কিন্তু বাঙ্গালায় শত সহস্র অদৃষ্ট এই রকম আছে বলিয়া আমার অদৃষ্ট-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম।

এখন বলি আমার মত হতভাগিনী-দিগের "গতি" করিবার জন্য বঙ্গদেশে কেহ বাঁচিয়া আছ কি?

শ্রী* * *

তটিনী ও সাগর।

তটিনী—শুনিয়াছি হৃদি তব উদার মহান্।
ও বিশাল হৃদে, সখে! পাব না কি স্থান?
ভ্রমি দেশ শত শত
নব নব রাজ্য কত,
তোমায় ভেটিতে এবে আকুল অন্তর,
ফেলিয়াছি দূরে কত কানন প্রান্তর।
হিমানী-গলিত জল,
সুশীতল, নিরমল,
আনিয়াছি তব তরে প্রেম-উপহার,
লও সখে! অর্পিলাম চরণে তোমার।
কাছে রহি অনুক্ষণ,
সান্ত্বনিব তব মন,
দয়া করি লবে না কি অর্চ্চনা আমার,
আশ্রিতে ঠেলিবে পায়ে ওহে পারাবার?
সাগর—অনুদিন শান্তিহীন যাহার হৃদয়,
কেন সাধ প্রবাহিণি, সান্ত্বনিতে তায়।
এই যে মূরতি মম,
যুগান্তপ্রলয় সম,
সফেণ তরঙ্গমালা জীবজন্তু-ত্রাস,
তার সনে মিলিবারে কেন অভিলাষ?
ভৈরব মূরতি হেরি
নাবিক আতঙ্কে ডরি
কূল অভিমুখে ছুটে লইয়া তরণী,
মহান্, উদার তারে বল নির্ঝরিণি?
নবীন নীরদ সম
যদিও সলিল মম,
লবণ মিশায়ে তায় রেখেছেন বিধি।
পানে মৃত্যু, এই ক্ষোভে দহি নিরবধি!
তোমার সলিলরাশি,
তৃষিতের তৃষা নাশি
প্রদানে অন্তরে তার আনন্দ অপার।
স্পর্শে মোর হবে বিষ জেন এই সার।
জানি আমি প্রবাহিণি,
তুমি জীবনদায়িনী,
বাঁচাও জীবের প্রাণ বারি বিতরণে,
হাস্যময়ী ধরা সদা তব আগমনে।
ফুটায়ে কুসুমরাশি,
হাসাইয়া দশ দিশি,
দগধ মরুভূ আদি কর সুশোভন।
ধন্য, প্রবাহিণি, ধন্য তোমার জীবন।

কিন্তু যে অশান্ত হৃদি
আলোড়িত নিরবধি—
সুখ নাই, শান্তি নাই, সতত চঞ্চল ;
সে হৃদয়ে শান্তি দানে যতন বিফল ;
তটিনী—অনন্ত জলধি সথে, এ কি তব ভ্রম!
কাতরে সান্ত্বনা দানে নারী কি অক্ষম ?
আর্ত্তের হরিতে দুঃখ
রমণীর চির সুখ,
মিশাতে ব্যথিত-হৃদে আপন হৃদয় ;
কর্ত্তব্যপালনে নারী বিচলিতা নয়।
পুরুষের সুখভাগে
রমণী দাঁড়াবে আগে,
দুঃখের দুঃখিনী হ'তে পাইবেক ভীতি,
এ হেতু গড়েনি বিধি রমণী-প্রকৃতি।
স্নেহ, দয়া কোমলতা,
প্রেম, ভক্তি, সরলতা
রমণীর হৃদে সথে, নিরন্তর রয়।
তোষে অকাতরে তারে, যে দেয় আশ্রয়॥

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

প্রধানধর্ম্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর্গগত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি যেমন সুলক্ষণাক্রান্ত ও সুন্দর ছিল, সেইরূপ তিনি একাধারে সুবিদ্বান্, সুকবি, দার্শনিক, সাহিত্যগুরু, স্বদেশ-প্রেমিক, উদার দাতা, কৃতী, গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মগতপ্রাণ মহর্ষি ছিলেন।

সংস্কৃত, ইংরাজী ও পারস্য তিন ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বলিতেন উপনিষদ্ আমার দক্ষিণ হস্ত এবং হাফেজ আমার বাম হস্ত। অনেক শাস্ত্র যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী বিজ্ঞানদর্শনের নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রায় তিনি তাহা পাঠ না করিয়া ছাড়িতেন না। কাণ্ট, কজিন প্রভৃতির দুরূহ দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজ মন্তব্য দিয়া গিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার করিয়া সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বপ্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের আদিগুরু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় মহোদয়গণ ইহার লেখক ছিলেন, শেষোক্ত দুই মহাত্মা তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিজনবর্গদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের যে অতুল শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারও মূল তিনি।

ব্রাহ্ম-সাহিত্যের প্রকৃত জন্মদাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নামোল্লেখ করিতেছি :—

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ—নিজ দিব্যজ্ঞানে হিন্দু-শাস্ত্র সকলের সার সংগ্রহ করিয়া তাৎপর্য্যসহ এই অপূর্ব্বগ্রন্থ প্রচার করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস—ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম শিক্ষার ইহা উৎকৃষ্ট সোপান।

তত্ত্ববিদ্যা—আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের কুঞ্চিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—গভীর ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত গভীর ব্রহ্মপ্রেমপূর্ণ ব্রহ্মানুপ্রাণিত উপদেশাবলী।

ব্রহ্মোপাসনা—প্রণালীবদ্ধ ঈশ্বরোপাসনার পথপ্রদর্শক।

অনুষ্ঠানপদ্ধতি—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গার্হস্থ অনুষ্ঠান সকল সম্পাদনের সহায়।

আত্মজীবনী—অতুলন জীবন-বিকাশের চিত্র।

মহর্ষির অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে প্রধান :—

শান্তিনিকেতন—তাঁহার সাধনসিদ্ধির স্থান, তাঁহার উন্মুক্ত হৃদয়ের উজ্জ্বল ছবি এবং ব্রহ্মসাধকদিগের জন্য তাঁহার অমূল্য দান। ইহার স্থায়িত্বের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ—রাজা রামমোহন রায়ের প্রদত্ত ভার বলিয়া অর্থে সামর্থ্যে ইহার রক্ষণ, পোষণ ও উন্নতিসাধন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার উইলে ইহার জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী—স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় ধার্ম্মিক এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী তাঁহার শিষ্য। পক্ষিমাতা যেমন ডিম্ব ফুটাইয়া থাকে, কেশবচন্দ্রকে তিনি সেইরূপে ফুটাইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ লোক সকল তাঁহার নিকট অনেক ঋণী। ভারতের সর্ব্বস্থলের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার হস্ত।

শ্রীমন্মহর্ষি প্রথম বয়সে স্বদেশের হিতসাধন জন্য নানাক্ষেত্রে খাটিয়াছেন। খৃষ্টান স্কুলে পড়িয়া যখন যুবকেরা খৃষ্টান হইতে লাগিল, তখন তিনি হিন্দুদিগের মুখপাত্র হইয়া "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" স্থাপন করেন, ইহা পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুল নামে পরিচিত হয় এবং বহুকাল চলিয়া স্বর্গীয় কেশব বাবুর স্থাপিত "কলিকাতা স্কুলের" সহিত মিলিত হয়। তিনি ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসন স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং ইহার প্রথম সম্পাদক। দেশের দুর্ভিক্ষ, মারীভয় প্রভৃতি নিবারণ এবং সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার দান-হস্ত মুক্ত ছিল।

তাঁহার কৃতিত্ববিষয়ে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি আপনার সুবিবেচনা, মিতচারিতা ও শ্রমশীলতা দ্বারা পারিবারিক বিপুল সম্পত্তির পুনরুদ্ধার, উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পিতৃত্যজ্য অতুল বিভব থাকিলেও পৈতৃক ঋণে তিনি নিঃসম্বলের নিঃসম্বল হইয়াছিলেন। আপনার পৌরুষগুণে ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে যথাযোগ্য ভাগ দিয়া এবং বহুগোষ্ঠী পালন ও প্রকৃষ্টরূপে দানধ্যান সমাপন করিয়া বংশাবলীর ভরণপোষণের জন্য প্রচুর সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অতি সুনিপুণ ছিলেন। যখন যে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,

তাহা পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

তাঁহার শোভনানুভাবকতা বৃত্তি অতি চমৎকার ছিল। কি শিল্প, কি চিত্র, কি কারুকার্য্য, কি গৃহের সাজসজ্জা, কি কাব্যসঙ্গীত সাহিত্য সকল বিষয়ে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে হিন্দুসমাজ গৌরবান্বিত এবং ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইয়া আসিয়াছে। "ব্রহ্মজ্ঞানী সত্যবাদী" লোকের এ ধারণা তিনিই জন্মাইয়াছিলেন। যখন পিতৃঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, তখন তিনি সে ঋণ অস্বীকার করিলে আইনমতে কেহ তাহার সম্পত্তি স্পর্শ করিতে পারিত না—আত্মীয় গুরুজনও সেই পন্থা অবলম্বনে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত ঋণ স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি বলিতেন, "আমি ধর্ম্মকে রক্ষা করিলাম, ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

তিনি আমীর হইয়া ফকিরী কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র, যাঁহার মাসিক জলপানি হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, তিনি সাংসারিক এমন কষ্ট নাই যাহা অম্লানবদনে বহন না করিয়াছেন। বৈটকখানার গালিচা ছুলিচা রাজবাঞ্ছিত আসবাব লুটাইয়া দিয়া নিজে কম্বল শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবৈরাগ্যে ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় সংসারের সকল ভোগ—এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ তিনি পাহাড় পর্ব্বত বনজঙ্গল ও নির্জনে কাটাইয়াছেন। কতদিন উপবাসে গিয়াছে। গৃহেতেও বিবিধ ভোগ্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও রাজর্ষি জনকের ন্যায় তিনি ভোগরত না হইয়া যোগরত হইয়া ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যথাকর্ত্তব্য সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। রাজা মহারাজারা তাঁহার সংসর্গ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, আবার দীনের দীন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

তিনি ভারতকে এবং সমুদয় জগৎকে যে অমূল্য ধন দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সেই ধন তাঁহার ধর্ম্মজীবন। রাজা রামমোহন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সমুদায় নরনারীর উপাস্য দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন ও বিঘোষিত করিয়া যান। শ্রীমন্মহর্ষি মহাসাধনায় সেই এক দেবতাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাটরূপে এবং আত্মার অভ্যন্তরে স্বরাট্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের সকল সন্তানকে অমৃতের সন্তান বলিয়া এই ভূমানন্দরসপানে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

'অমৃতের খনি পাইনু যখন জয়জয় তোমারি,
ধন্য ধন্যনা ধ আজি দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে (জগতে)
প্রচারি।"

এই তাঁর হৃদয়ের ভাষা কবিতাকারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আদি-ব্রাহ্মসমাজের মধুর মোহন ও গভীর ভাবপূর্ণ কত ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার ভাব ও কবিত্বের উদ্ভাসন মাত্র।

মহর্ষি দেখাইয়াছেন প্রত্যেক মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং জাতি বর্ণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল নরনারী তাঁহার উপাসনার অধিকারী।

মহর্ষি দেখাইয়াছেন অন্তরের প্রীতিযোগে সেই অন্তরস্থ প্রেমময় দেবতাকে পূজা করা যায় এবং তিনিই বাস্তবিক পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, পৃথিবীর আর আর সকল প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয়। এই ব্রহ্মোপাসনাকে মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

"এক সেই পরমেশ্বরের উপাসনাতে পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণ হয়। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

"ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম জানিয়া সমুদায় হৃদয় মন প্রাণের সহিত তাঁহাকে প্রীতি কর এবং সংসারক্ষেত্র তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন-স্থান জানিয়া তাঁহার ধর্ম্মনিয়মের অধীন ও ব্রহ্মপ্রীতিকাম হইয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইবে।"

তাঁহার ব্যবস্থাপিত এই সাধনে নিজে সিদ্ধ হইয়া তিনি শান্ত দান্ত বিবেকী ও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষো ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"—যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং ক্রিয়াশীল, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই মহাঋষি-বাক্যের সার্থকতা নিজের জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ঋষিজীবনের উন্নতি-ক্রম বুঝিতে চান, তাঁহারা তাঁহার স্ব-রচিত জীবনবেদস্বরূপ আত্মজীবনী অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করুন।

আলোক ও অন্ধকার।

বর্ত্তমানযুগে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া অমরকবি স্কটের কয়েকটী পংক্তি মনে আসে—

"The rose is fairest when 'tis budding new,
And hope is brightest when it dawns from fears :
The rose is sweetest washed with morning dew,
And love is loveliest when embalmed in tears"

এই অল্প সময়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যে সুফল প্রসব করিয়াছে ও দিন দিন বঙ্গের

গৃহলক্ষ্মীদিগের মধ্যে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়া যে নূতন শোভা ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে স্রষ্টের মানসপটে অঙ্কিত উক্ত সুকোমল সৌন্দর্য্যের আভা এখানে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। এদেশে শিক্ষার যে সামান্ত ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যেই নারী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চিন্তা ও ভাবের গভীরতায় নারীর হৃদয় পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ এবং স্ত্রী-কবির কাব্য এবং কবিতা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়াও নারীজাতি হৃদয়ের ভাষায় জগতের সৌন্দর্য্যগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিতেছেন। আমরা জ্ঞানাভিমানে যে সকল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম, তাঁহারা হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

যাহাহউক বর্ত্তমান সময় স্ত্রীশিক্ষার উষাকাল হইলেও মেঘক্লিষ্ট প্রভাতের ন্যায় অনেক সময় প্রভাত সন্ধ্যা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কতকগুলি অসার ও ভিত্তিহীন যুক্তি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে নানাবিধ বিকৃত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অপর কাহাকেও এ বিষয়ে অগ্রসর দেখিলে তাঁহাদের বহু-দিন-পোষিত ও সযত্নসঞ্চিত মতগুলি নানাবিধ কল্পনা-রঞ্জিত আকারে প্রকাশিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এস্থলে একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার একটী বন্ধু বলিয়াছিলেন 'পদ্মে গন্ধ নাই'। আমি বলিলাম 'আছে'। তিনি নানাবিধ যুক্তিতর্কদ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, পদ্মে গন্ধ নাই। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি প্রকার পদ্মের আঘ্রাণ লইয়া দেখিয়াছেন?"—তিনি বলিলেন "আমি নিজে আঘ্রাণ করি নাই, শুনিয়াছি যে পদ্মের গন্ধ নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কয় প্রকার পদ্ম দেখিয়াছেন?" বন্ধু বলিলেন "আমি পদ্মফুল কখনও দেখি নাই—শালুক ফুল দেখিয়াছি"। আমি বলিলাম "আমি তিন শ্রেণীর পদ্মফুল দেখিয়াছি এবং তাহাদের পরীক্ষা করিয়া অল্পাধিক পরিমাণে সৌরভ পাইয়াছি। পদ্মের সৌরভে তীব্রতা নাই, কিন্তু তাহাতে স্নিগ্ধ চিত্তহারী সৌরভ বর্ত্তমান আছে।" তখন বন্ধু নিরস্ত হইলেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সচরাচর নানাবিধ যুক্তি প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আমার উক্ত বন্ধুটীর মত। দূর হইতে তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাকে দেখিয়া সৌরভহীন স্থির করেন এবং যদি ঘটনাক্রমে কাহারও কোনও ত্রুটি দেখিতে পান, তাহা সময়োপযোগী ব্যবহারের নিমিত্ত অক্ষয় কবচরূপে বাঁধিয়া রাখেন।

শিক্ষাদ্বারা নারীহৃদয় যে বিশাল ও গভীর হয়, সে সম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যে সকল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,

তাহা অতি বিস্ময়জনক। শিক্ষাতে আত্মাকে বিশ্বজনীন প্রেমে পূর্ণ করে। যাহাতে আত্মত্যাগ ও পরসেবা আত্মার অন্নপান হইয়া যায়, সেই শিক্ষা হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত রাখিবার অধিকার কে স্বার্থপ্রণোদিত পুরুষজাতিকে দিয়াছিল? ঈশ্বরপ্রদত্ত এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা অবশ্যই ধর্ম্ম হইতে পতিত ও ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইব।

নারীজাতির হৃদয়ে শিক্ষার প্রভাব কি পরিমাণে কার্য্য করে, দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

বঙ্গদেশের কোনও এক নগরে একটী বিধবা তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া বাস করিতেন। হঠাৎ বিসূচিকা-রোগে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইল। উক্ত মহিলা ক্রিশ্চিয়ান্ মহিলাদিগের নিকট বৈধব্যাবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবান্ দুঃখিনীর দুঃখ নিবারণের এক সহজ উপায় দেখাইয়া দিলেন। উক্ত মহিলার স্বামীর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ছিল। এক্ষণে সেইগুলি তাঁহার শোকনিবারণের উপায় স্বরূপ হইল। তিনি সেইগুলিতে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুদিন পরে পূজনীয় ভগিনী ডোরার বিষয়ে তিনি অনেক কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনী ডোরার চরিত্রের প্রভাব ঐ মহিলার মধ্যে এত প্রবল হইল যে, অবশেষে তিনি কন্যাকে লইয়া কোনও ধর্ম্মাশ্রমের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। পরে সেই বিধবা মহিলার জীবন জ্ঞান, প্রেম, ভক্তিতে এত উন্নত হইল যে, তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনেকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা অন্য প্রকারের। একদিন সন্ধ্যায় একটী যুবক কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। উক্ত যুবকের ভগিনী উদ্যানের নিকটস্থ কোনও স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বেশ অন্ধকার হইয়াছে। হঠাৎ যুবকদিগের মধ্যে একজন বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। একজনের পকেটে দেয়াশলাই ছিল—জ্বালিয়া দেখিলেন সর্পে দংশন করিয়াছে। সর্পদংশনের কথা শুনিয়া সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলা আলো লইয়া আসিয়া প্রথমে অস্ত্রের আঘাতে সর্পটীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর আহত ব্যক্তির দষ্টস্থানে আপনার অধরোষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া বিষাক্ত শোণিত বাহির করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। মহিলার বুদ্ধি-কৌশলে সে যাত্রা যুবক বাঁচিয়া গেলেন। শুনিয়াছি এখনও সেই যুবক উক্ত মহিলার কথা শুনিলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া

তাঁহার করুণা স্বীকার করেন ও তাঁহাকে মাতৃবোধে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

এইরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে শিক্ষিতা মহিলাদিগের জীবনে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষাব্যতীত রমণী-জীবনে যে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইলে তাহা আরও মঙ্গলপ্রদ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অন্যান্য দেশের কার্য্যক্ষেত্রে নারীজাতি যেরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাও সর্ব্বজন-বিদিত। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবাথের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার কথা অনেকেই জানেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা ও রাজ্ঞী উইলিয়ম্ ও মেরীর কথা ইতিহাস-পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে স্ত্রীর রাজ্যশাসনে প্রজাবর্গ প্রীত এবং রাজ্য সুশাসিত হইয়াছিল। লর্ড মেকলে ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"Unhappily sarcasm and invective directed against William were but too likely to find favourable audience. * He was in truth far better qualified to save a nation than to adorn a court."

পক্ষান্তরে—

"She (Mary) was excellently qualified to be the head of the court,... ......Her understanding, though very imperfectly cultured, was quick... ... ... The stainless purity of her private life and the strict attention which she paid to her religious duties were the more respectable, because she was singularly free from censoriousness, and discouraged scandal as much as vice."

সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কার্য্য-কুশলতা ও চরিত্র মাহাত্ম্য জগতে অতুলনীয়। সুতরাং কি এদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র নারীজাতির শ্রেষ্ঠতা অনেক বিষয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রমণীদিগের মধ্যে অনেক সময়ে যেরূপ প্রবল দেখা যায়, পুরুষ-জাতির মধ্যে সেরূপ বিরল। এ সকল সত্ত্বেও তাঁহাদের যোগ্যতা অস্বীকার করিলে আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

কোন কোন বিষয়ে পুরুষজাতিকে স্বার্থ খর্ব্ব করিতে হইবে ইহাই মোট কথা। ইহার জন্যই স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বিপক্ষদের এত বাগ্‌বিতণ্ডা। ভিতরের আরও দুই একটা কথা আছে, তাহা অনুমান করা বড় কঠিন নহে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বঙ্গ-দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। বঙ্গগৃহের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং বঙ্গের ভবিষ্যবংশের চরিত্র ও প্রতিভা সকলই নারীজাতির উৎকর্ষসাধনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। স্বার্থ-প্রণোদিত যুক্তি তর্ক দ্বারা যিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হইবেন, তাঁহাকে ভবিষ্যবংশের তিরস্কার ও অভিসম্পাতের বোঝা বহন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই জাতীয় ও সামাজিক দুর্গতির দিনে বঙ্গমহিলাগণ যদি শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সহায়তা করিতে প্রস্তুত না হয়েন ; জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও কর্ম্মে যদি নরনারী সমভাবে পরস্পরের সহিত অন্তরের

ভাবের বিনিময় করিতে না পারেন, একে অপরের শ্রান্তিতে শান্তি দিবার জন্ত উৎসুক না হয়েন, তবে বঙ্গগৃহ শ্মশান হইতে ভীতিকর ও মরুভূমি হইতেও ভীষণ আকার ধারণ করিবে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাই ভ্রমণ।

(শেষ)

পারসী রমণীরা লেখাপড়া অপেক্ষা শিল্পকার্য্যে অধিক মনোযোগিনী। ইহাদের আচার ব্যবহার অর্দ্ধ-হিন্দু ও অর্দ্ধ-যাবনিক ভাবে পরিচালিত। স্ত্রীগণ পাজামা ও শাড়ী দুইই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আহারাদি অবশ্য টেবিলের উপর স্ত্রীপুরুষ একত্র করেন। গৃহসজ্জা ও সামগ্রী সকলি ইংরাজি ধরণের হইলেও সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী দেখিলে আধুনিক বাঙ্গালীগৃহ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন রীতানুসারে এখনও প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় আলিপানা প্রত্যেক ঘরের দ্বারে দেওয়া হয়। উপাসনাপ্রণালী অতি অদ্ভুত প্রকারের। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় কোন যুবক বা যুবতী আসন্ন পরীক্ষার জন্ত পাঠ কণ্ঠস্থ করিতেছেন ও পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। ধর্ম্মপুস্তকগুলি বাইবেলের আকারের, দিবসে চারি পাঁচ-বার উপাসনা করা নিয়ম। পারসীদিগের ধনের ও দানের কথা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহারা অত্যন্ত ইংরাজী অনুকরণ-প্রিয়। যদিও ইহারা অন্ত কোনও জাতির সহিত তত মেলামেশা করিতে চাহে না, তথাপি বিদেশীদিগের প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা ও নম্র ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার পরিচিত পরিবারের বন্ধুত্বে ও সৌজন্যে আমি পরমাপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

পারসীদের ঐতিহাসিক কল্পিত নানা গল্প আছে। বাস্তব কথা—যখন পারস্তের শাহ দ্বারা উহারা উত্যক্ত হইয়া পলাইয়া গুজরাটে আইসে, সেই সময় জনৈক হিন্দু রাজা যদুরাণা কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া উহারা বাসস্থান প্রাপ্ত হয়। তিনিই উহা-দিগকে হিন্দু বিধি পালন করিতে আদেশ করেন। সেই সময়ে উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া তাহারা কিছু কিছু হিন্দু নিয়ম পালন করিতে থাকে। পরে বম্বে নগরী ইংরাজাধিকৃত হইলে সর্ব্বাগ্রে পারসীরা তথায় আসিয়া বাস ও কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। এজন্ত ইহারা এখানকার প্রধান অধিবাসী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পারসী রমণীগণ বহুমূল্যের শাড়ী ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অল-ঙ্কারের পারিপাট্য বা আধিক্য নাই। সামান্ত গহনা—হাতে কেবল ২ গাছি সরু চুড়ি, গলায় চেন। পারসী রমণীরা

এই রকম অতি অল্প ও স্বল্পভাবে গহনার ব্যবহার করেন। কিন্তু কাঁচের চুড়ি ইহাঁদের অতি প্রিয় ও লক্ষণযুক্ত ভূষণ। সধবামাত্রকেই ইহা পরিতে হইবে—অবশ্য একগাছির অধিক নহে। ইহাঁরা রেশমের শাড়ী ভিন্ন কখনই সুতার কাপড় ব্যবহার করেন না। অতিবৃদ্ধা গৃহিণীরা শাড়ী না পরিয়া কেবল একটি রেশমের ইজার পরিয়া বাড়ীতে আগন্তুকের নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করেন না। পারসী রমণীরা প্রায় সকলেই সুচতুর—সকলেই 'পরদা'র বিপক্ষ। আমাকে সেই গৃহিণীটী একদিন বলিয়াছিলেন "তোমরা এইটুকু পথ গাড়ী করিয়া আইস ও একা আসিতে পার না, আমাদের মেয়েরা একা বিলাত যাইতে পারে"। বাস্তবিক দেখিলাম, বাঙ্গালা অপেক্ষা বোম্বাই এ সকল বিষয়ে উন্নত। আমাদের দেশের পুরুষেরা বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেক উন্নত হইয়াও সামাজিক সংস্কার ও একতায় পারসীদের মত শ্রেষ্ঠ-পদ লাভ করিতে পারেন নাই। বোম্বাই নগরী পারসী, গুজরাটি ও দক্ষিণীর দেশ বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর অগম্য স্থান নাই। এই সমুদ্রতটবর্ত্তী বন্দরটির বহুলজনাকীর্ণ স্থান ভেদ করিয়া বাঙ্গালী পরিবার চিত্রপটের ন্যায় বাস করিতেছেন। অবশ্য রেলওয়ে বিভাগই ইহাঁদের শোভাবর্দ্ধনের স্থান। আরও দুই চারি জন বস্ত্রালঙ্কার-ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত পুরাতন বাসীন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। এই বাঙ্গালীমণ্ডলী কেহ কেহ সপরিবারে, আবার কেহ কেহ অপরিবারে আছেন। প্রায় অধিকাংশই গ্রাণ্ডরোডে বাস করেন। কিন্তু সকল জাতি অপেক্ষা ইহাঁদেরই দুর্দ্দশা অধিক। এমন দুর্ম্মূল্য স্থানে বেচারী নিরীহ দুর্ব্বল পরাধীন বাঙ্গালীর কি প্রাণ বাঁচে? বোম্বাই ধনী ও দরিদ্র ইতর কুলী মজুরগণের পক্ষে সুখের স্থান বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অতি কষ্টকর। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা চিরপ্রসিদ্ধ "বাবু", তাঁহাদের এই আখ্যাই যত দুঃখের মূল। বাবু জাতিরা বিষম লঙ্কা পলাণ্ডুভোজী দক্ষিণীগণের ন্যায় বাস করিতে পারেন না। শ্রীনি—

ক্ষুদ্র কবিতাচতুষ্টয়।

জিজ্ঞাসা।

(কার্ত্তিকের জিজ্ঞাসা পাঠে)

হে দেবতা, এ জগতে সুখ দুঃখ দিয়ে,
কত লীলা করিতেছ দিবস রজনী।—
মূঢ় আমি, ভ্রান্ত আমি, তাই নিরখিয়ে
সংশয় আঁধারে পথ হারাই আপনি।
তার পর ভেবে দেখি তুমি দয়াময়,
প্রেমের বিধান সবি প্রেমশূন্য নয়;
অনন্তের প্রেমবিন্দু মানব-হৃদয়,
তাপিতের শান্তিবারি, অনন্ত নির্ভর—

সে হৃদয়ে যতটুকু দেহ প্রেম-ভার,
দিবানিশি করি মোরা তারি অপচয়!
তাই এত অশ্রুধার, এত হাহাকার,
করুণ বিলাপ-ধ্বনি শুনি বিশ্বময়!
তৃষিতে তোমার প্রেম, করুণা তোমার
বিলাতে শকতি কবে দিবে দয়াময়?

উন্মাদ।

(১৯০০ সালে গয়ায় রচিত)

ভগন উপলখণ্ডে গভীর নিশায়,
সমুন্নত বনময় গিরিপাদ-মূলে—
আধ অন্ধকার মাখা, আধ' জোছনায়,
ব'সে আছি জীবনের লক্ষ্যপথ ভুলে।
প্রস্তর-আঘাতে শ্রান্ত চরণযুগল—
স্রাবিয়া শোণিতধারা হয়েছে অবশ,
সঘন স্পন্দন বুকে, হৃদয় দুর্ব্বল,
দীপ্তিহীন আঁখি-তারা, শরীর বিবশ!
ছায়াসম গিরিকোলে শৈলখণ্ডগুলি
অঙ্কেতে চিহ্নিয়া কত অতীতের স্মৃতি
আছে স্থির দাঁড়াইয়া জন্মমৃত্যু ভুলি'—
ব্যতিক্রমি' প্রকৃতির চিরন্তন রীতি!
সহসা গগন-কোলে হাসিল বিজলী,
শুনি উন্মাদের ক্ষীণ সকরুণ গীতি!

সন্ধ্যায় ঢাকানগরী।

(প্রথম পদার্পণ, ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৪)

বৈদ্যুতী আলোকমালা সৌধশ্রেণী বুকে,
কৌমুদী মাখিয়া ঢাকা হাসিছ কেমন!
হায় তুমি—দেখিবারে এই হাসি সুখে
এসেছি পদ্মার বক্ষ করিয়া লঙ্ঘন।
জ্ঞানচক্ষু যতদিন খুলেছে জীবনে,
তব নামে আসিয়াছে কত অভিনব
চিন্তা, সুখ, কৌতূহল হৃদয় কাননে,
কল্পনা-নয়নে হেরি রূপরাশি তব।
চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই, অমর-বাঞ্ছিত,
হে ঢাকানগরী, আজ দেখিয়া তোমায়,
অতীত কাহিনী কত চির-পরিচিত—
স্মৃতিপথে সমুজ্জ্বল আজ মম ভায়।
রাজবল্লভের কথা, মোগল-পীড়িত,
যাঁর সনে বঙ্গলক্ষ্মী লইলা বিদায়।

উষায় ঢাকানগরী।

(১লা মে, ১৯০৪, রচিত)

বিশাল নগরীখানি শিশুর মতন—
ঘুমায়ে রয়েছে স্থির বিমল উষায়,
বিবশ শিথিল হ'য়ে নাগরিকগণ
এখনো পড়িয়া আছে সুখের শয্যায়।
দিবসের কোলাহল জাগেনি এখন—
রাজপথে জনস্রোত নাই এবে আর,
যেন কোন্ মহাঋষি ধেয়ানে মগন,
ধীরে তাঁর হইতেছে চেতনা সঞ্চার।
প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
ইতিহাস-বিজড়িত পুরাতন স্মৃতি—
আনিছে বহিয়া যারে হৃদয়ের পাশে,
পুরাতন চিহ্ন কত, বিষাদের গীতি!
তোমার নিদ্রিত ক্রোড়ে বসিয়া এখন,
দেখি তব সৌম্যমূর্ত্তি ভরিয়া নয়ন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজোন্নতিতে নারী-জাতি।

প্রাচীন কালে যে বিশেষরূপে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং তাহার সেই অমৃতময় ফলে গার্হস্থ্য জীবনে রমণী জাতি যে সুধাস্রোত প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থাদি ও ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিস্তারিতরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মধ্যবর্ত্তী যুগেই নরীজাতির ঘোরতর অধঃপতন ঘটিয়াছে, এই সময় হইতেই নারী জাতি মানব-সমাজে নগণ্যরূপে গণিত হইয়াছেন।

নারীজাতিকে এরূপ নগণ্য করিয়া রাখিলে সামাজিক উন্নতির যে গভীর অন্তরায় ঘটিবে, তাহা অবশ্য চিন্তা করা উচিত। অধুনা সমাজোন্নতির জন্য অনেকেই আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সেই উন্নতির মূলভিত্তি কোথায়? তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই ভারত একদিন গুণ-গরিমায় শৌর্য্যে বীর্য্যে বিভূষিত ছিল, আর এখনই বা এমন দীনতাপূর্ণ কেন? যদ্যপি প্রকৃতই সমাজোন্নতি করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে এই চিন্তার প্রয়োজন।

অধুনা ইংরাজাধিকারে আমাদের নৈতিক জীবন একদিকে বহু পরিমাণে মার্জ্জিত হইতেছে, অপর দিকে আমরা নানাপ্রকারে হীনবল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। ইহার কারণ কি? ইহার মূল কারণ কুসংস্কার জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে আমাদের সামাজিক উন্নতি সুদূর-পরাহত। এই কুসংস্কারের জন্ম কোথায়, কিরূপে ইহার মূলোৎপাটিত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমাদের অন্তঃপুরই যে কুসংস্কারের জনক—নারী-জীবনই যে কুসংস্কারের লীলাভূমি, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজোন্নতির আশা বাতুলতা মাত্র। মানব জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমেই জননীর মুখ দেখিতে পায় এবং জননীর স্তনদুগ্ধেই তাহার জীবন পরিবর্দ্ধিত হয়। সেই দুগ্ধ যতই মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইবে, মানবজীবনও যে ততই মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইবে তাহা নিশ্চয়। এই জন্যই সুমাতার সন্তানগণ স্বতঃই সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবনও উদ্যম, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষায় অন্যের অপেক্ষা বহু উচ্চতর। ইতিহাস আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, সুমাতার সন্তানগণই জগতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অমর অক্ষরে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব যদি প্রকৃতভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি—সমাজোন্নতি

লাভ করিতে হয়, তবে নারী-জীবনকে মার্জ্জিত করিতে হইবে।

শিক্ষা, রুচি, সাধনা এই ত্রিবিধ প্রণালী জীবনের উন্নতির মূল। নারী-জীবনে এই ত্রিবিধ প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে আমাদের জাতীয় জীবনও যে উন্নত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

নারীজাতির শিক্ষা বিস্তারের সহিত আমাদের সামাজিক কুসংস্কার সকল বিদূরিত হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে বহু পাপস্রোতও নিবারিত হইবে। আমাদের সমাজে বাল-বিধবাদিগের বুক-ভাঙ্গা অশ্রুজলের মূল কারণ আমাদের চিরন্তন কুসংস্কার এবং সেই কুসংস্কারের ফলেই ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাপে আমাদের সমাজ জর্জরীভূত।

অধুনা বহু পরিমাণে রমণী-জীবন উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলে কয়েকটী উচ্চাশয় রমণীর অভ্যুদয়ও হইয়াছে। কিন্তু কেবল কয়েক জনের চেষ্টাতে একটি বিশাল সমাজের উন্নতিলাভ অসম্ভব।

যে দিন সমগ্র হিন্দুসন্তান গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির সহায়তা সম্পূর্ণ আবশ্যক জ্ঞানে তাঁহাদের সহিত মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবেন, সেই দিনই নারী-জীবনের হীনতা কালিমা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে এবং সমাজে অমৃত-স্রোত প্রবাহিত হইবে। গার্হস্থ্য জীবনে—সামাজিক জীবনে নারীজাতি যে মূল ভিত্তি এবং এ সকলের উন্নতি সাধনে নারীজাতির সহায়তার যে সমধিক প্রয়োজন, তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী,
কটক।

আমাদের মহর্ষি।

আমাদের মহর্ষি ঠাকুর!—আমরা হতভাগ্য বঙ্গবাসী, আমরা পরাধীন, আমরা দীনহীন, আমরা রাজপুরুষদিগের নিকটে পশুতুল্য বিবেচিত। আমাদের মত হতভাগ্যদিগের বড় গৌরবের, বড় আনন্দের, বড় আরামের আমাদের সেই মহর্ষি ঠাকুর!—তিনি এই বঙ্গজননীর কোলে জন্মিয়াছেন, এইখানে মানুষ হইয়াছেন, তার পরে এইখানেই মানুষের উপরে উঠিয়া নর-দেবতা হইয়াছেন!—আমাদের সেই মহর্ষি ঠাকুর!—আমাদের সেই দরিদ্রের রত্ন, দুঃখীর সৌভাগ্য-স্মৃতি, শোকার্ত্তের শান্তিপর্ব্ব—তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এতক্ষণ সকলেই শুনিয়াছেন, বঙ্গজননীর অঞ্চল হইতে সে উজ্জ্বলতম রত্ন খসিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ সকলেই শুনিয়াছেন বঙ্গজননীর সে গৌরবস্পর্দ্ধা কালরাহুর কবলে

পড়িয়াছে, এতক্ষণ সকলেই শুনিয়াছেন আমাদের মহর্ষি ঠাকুর আমাদিগকে ফেলিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন! যিনি জ্ঞান ধর্ম্ম, বিদ্যা বুদ্ধি, রূপ গুণ, ধন মান, ভাগ্য যশঃ, সুসন্তান সুকীর্ত্তি প্রভৃতি মানবজন্মের সকল সৌভাগ্য লাভ করিয়া বঙ্গবাসীদিগের জাতীয় সম্রাট্‌রূপে বিরাজ করিতেছিলেন, এত পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়াও যিনি গীতোক্ত

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"

রূপে সর্ব্বস্ব ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া নিজ সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছেন, যিনি অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বলে জীবিত-কালেই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, আমাদের বঙ্গভূমিকে আঁধার করিয়া আমাদের সেই মহর্ষি ঠাকুর দিব্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন! সেই ধবলাচলসদৃশ উন্নত, সেই সুধাধারা তুল্য পবিত্র, সেই শ্বেতপদ্মতুল্য কমনীয় মূর্ত্তি পুণ্যতোয়া ভাগীরথীবক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তাই দশকোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে হাহাকার উঠিয়াছে, সকলের মাথায় যেন আকাশ খসিয়া পড়িয়াছে, কি যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলিব কি করিয়া?

কেন এমন হইল?—জগতে তো প্রতিক্ষণ কত শত মানুষ মরিতেছে, কত শত হাহাকার উঠিতেছে, আবার উৎসবের আনন্দকোলাহলে সে সব মিশিয়া যাইতেছে। আলোক আঁধার, সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু ইহা লইয়াই তো আমাদের জগৎ, তবে মহর্ষির জন্য এ দেশের এমন সর্ব্বনাশ হইল কেন?

সে কথা এই যে, রাহু যখন সূর্য্যকে গ্রাস করে, তখন শতসহস্র প্রকারে আলোকসত্ত্বেও সমস্ত পৃথিবী আঁধার হইয়া যায়, কেননা জগতের পক্ষে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল জ্যোতিক আর নাই। আজি যে এদেশে দশকোটি মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে দেশের এরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারও কারণ এই যে আমাদের মহর্ষির মত দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ মানবরত্ন আর নাই! আমাদের মহর্ষি অকালে পরলোকে যান নাই, নিজের কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া যান নাই, নিজের মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকিতে যান নাই—সে সব ক্ষোভ আমাদের নাই; আমরা কাঁদিতেছি আমাদের দেশে আর মহর্ষিদেব নাই! দেশে বিদ্বান্ আছেন, বুদ্ধিমান্ আছেন, চরিত্রবান্ আছেন, ধার্ম্মিক আছেন, আমরা গর্ব্ব করিতে পারি এমন লোক ঈশ্বরকৃপায় এখনও দেশে আছেন, কিন্তু মহর্ষির মত ভোগী হইয়াও যোগী, গৃহস্থ হইয়াও ত্যাগী, সংসারী হইয়াও ঋষি—এক কথায় সেই পুরাকালের জনক-রাজ এমন আর নাই। তাই মহর্ষির জন্য আমরা শোকাকুল, তাই মহর্ষির জন্য আমরা এমন সর্ব্বনাশগ্রস্ত।

শাস্ত্রে আছে "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"। যখন সুযোগ্য হস্তে মহর্ষির সম্পূর্ণ

জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে, তখন সকলেই বুঝিবেন মহর্ষি দেব ঐ কথার জীবন্ত উদাহরণ। অতি তরুণ বয়সে মহর্ষি যে সকল প্রলোভন হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা মর মানবের দুষ্কর, দুঃসাধ্য।—কেবল সেই ধার্ম্মিককে মহা অধঃপতন হইতে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছেন। কতবার মহর্ষি মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাহাও সেই ভগবৎপ্রসাদে; ধর্ম্মকে জীবনের অবলম্বন করিয়া, ভবসমুদ্রে সাঁতার দিয়া মহর্ষি অমরতার পারে উঠিলেন, শুনিয়াছি পুরাকালে ঋষিগণও এই রকম করিতে পারিতেন।

আমাদের মহর্ষি চলিয়া গেলেন!—শোকমোহের অতীত, জরা মরণের অতীত, পুণ্যময় অমর লোকে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া গেলেন না; যাহা মর মানবের দুর্লভ, যাহা প্রাপ্তিতে জন্মের সার্থকতা, যাহা শত সহস্র তপস্যা-লব্ধ, এ হেন আদর্শ জীবন আমাদের জন্য এখানে রাখিয়া তার পরে মহর্ষি চলিয়া গেলেন। এখন আমাদের মধ্যে যাহার প্রকৃত ভক্তি আছে, যাহার সাধনার শক্তি আছে, যাহার "মানুষ" হইতে আকাঙ্ক্ষা আছে, সে এই অমর জীবনকে আদর্শ করিয়া আত্মগঠন করুক। মহর্ষির জন্মগ্রহণে এ হতভাগ্য দেশ ধন্য হইয়াছে, এ পতিত জাতি ধন্য হইয়াছে, যাঁহারা মহর্ষির পদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া জীবন-পথে চলিবে, তাহারা আরও ধন্য হইবে। মহর্ষি অমূল্য রত্নরাজি ছড়াইয়া গিয়াছেন, কে কুড়াইয়া লইবি চলিয়া আয়! কে দেবতার চরণে আত্ম-বলি দিয়া অমর হইবি, চলিয়া আয়! কে ভগবৎ-পদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিবি, চলিয়া আয়! কে বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিবি, বাঙ্গালীর লজ্জা ঘুচাইবি, একবার চলিয়া আয়!

দেবতা! তুমি যেখানেই থাক, এ জগতে অজর অমররূপে বিরাজিত হইলে। এ পতিত জাতিকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার আদর্শে ইহারা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে; এ অধম দেশকে আশীর্ব্বাদ কর যেন উহা তোমার মত অমূল্য রত্ন আরও পাইয়া প্রকৃত গৌরবান্বিত হইতে পারে।

শ্রীমা—

শ্মশানে শান্তি।

মায়ামরীচিকাপূর্ণ সংসারে সর্ব্বদা অশান্তি-নিপীড়িত মানবের শান্তি কোথায়? যাহাকে তুমি শান্তি বল, আমি তাহাকে শান্তি বলি না। তুমি হয়ত শত শত মানবের ধ্বংস সাধন করিয়া, শত শত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া

লইয়া নিজে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছ, বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছ, আজ্ঞামাত্র তোমার শত শত দাস দাসী অবনতমস্তকে উপস্থিত। ঐ দেখ, তোমার দ্বারে অন্ন-বস্ত্রহীন শত শত দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষার্থে দণ্ডায়মান। তোমার শতসহস্র দেশবাসী অজ্ঞান-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় আচরণে রত। তোমার সেদিকে দৃষ্টি নাই। উহাদের গভীর আর্ত্তনাদ, যন্ত্রণা-পরিপূর্ণ চীৎকার তোমার ঘোর মায়া-মোহ-পূর্ণ বিলাস-সাগরনিমজ্জিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াও করিল না, তুমি শুনিয়াও শুনিলে না। তুমি কি শান্তি উপভোগ করিতেছ? ঐ দেখ, তোমার আর একটি ভ্রাতা তোমার ন্যায় শান্তিলাভার্থে জলন্ত পাবকে মক্ষিকার ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ ধাবমান। পরমতত্ত্ব—স্বর্গীয় জ্ঞান ভুলিয়া ক্ষণস্থায়ী সংসারের সুখের জন্য চির-লালায়িত—শরীরের অবসাদে কটাক্ষপাত না করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে রত। মস্তক-স্বেদ চরণে দর দর ধারায় পতিত হইতেছে, মস্তকোপরি ঝড় তুফান বহিয়া যাইতেছে, তোমার দৃষ্টিপাত নাই। তুমি শূন্যে সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত।

অর্থই তোমার শান্তি প্রদানের প্রধান উপকরণ। তুমি তোমার ভ্রাতা ভগিনী, দারা পুত্র লইয়া সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। তোমার স্বজনবর্গ ক্রমে ক্রমে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতেছেন। তোমার আর কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত নাই। জগতের প্রকাণ্ড-রাজ্যে তোমার আমিত্ব মহারাজ্য বিস্তার করিয়া তাহার উপভোগে রত। অন্যের কথা, অন্যের বিষয় তোমার আমিত্বময় জীবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না।

তুমি মনে মনে ভাবিতেছ তুমি পরম ধার্ম্মিক, হয়ত তুমি ধর্ম্মতত্ত্বের কণামাত্রও অবগত নও। জগৎপিতার সন্তানকে দেখিলেই তুমি তোমার ধর্ম্মভয়ে ভীত হও, নাসিকা কুঞ্চিত কর। বিধর্ম্মীকে স্পর্শ করিব, তাহার সহিত একাসনে বসিয়া ভক্ষণ করিব, তাহার সহিত ভ্রাতৃ-ভাবে আচরণ করিব, এই সকল সমস্যা তোমার মনোমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজিত। তোমার ভ্রাতার প্রতি ইতরজন্তুবৎ আচরণ করিতেছ, ভাবিতেছ তুমি শান্তি-রাজ্যে বাস করিতেছ। মানব, একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ক্ষণকালের জন্য তোমার এ সকল অসার-জল্পনা-পূর্ণ "আমার" "আমার" ভ্রান্তিকথা ভুলিয়া মরীচিকাপূর্ণ সংসারসুখ-স্বপ্নের আবরণ উন্মোচন করিয়া ভয়াবহ পরিণাম-কথা স্মরণ কর। স্মরণমাত্র তোমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর দুর দুর করিতেছে, তৎ-ক্ষণাৎ শ্মশানের সেই ভয়াবহ চিত্র—অর্দ্ধ-দগ্ধ মস্তকচ্ছিন্ন নরকঙ্কালপূর্ণ শ্মশানের সেই বিভীষিকাময় চিত্র তোমার মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে।

শ্মশান! তোমার এ পুণ্যময় ক্ষেত্রে কি

মূর্খ, কি জ্ঞানী সকলেই কোন না কোন সময় একবার চরম শয়নে শয়ন করে। শ্মশান! জানি না তোমার এই ভয়াবহ মহানাম-শ্রবণে মানবের মনে কেন ভয়ের সঞ্চার হয়। জানি না, তুমি মানবের নিকট কেন এত ঘৃণিত, ভীতিপ্রদ ও উপেক্ষিত। মানব যখন অহঙ্কারমদে মত্ত থাকে, সুকোমল শয্যোপরি শয়ন করিয়াও মশক-দংশনে অধীর হয়, বৃথাবাক্যব্যয়ে স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখাইতে সচেষ্ট হয়, হিংসা দ্বেষ ভেদজ্ঞান মান অভিমানে পরিচালিত মানব যখন স্বার্থপরতার জলন্ত ভূমিতে বিচরণ করে, তখন তোমার নিত্য আজ্ঞা-বহ দাস মৃত্যুকে পাঠাইয়া তাহাদের মানসাকাশে রহস্যময় পরিণামের কথা বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ উদিত করিয়া দাও বলিয়া তুমি মানবের নিকট অসার, ঘৃণিত, বিভীষিকাময়। শ্মশান! তুমি শিক্ষালাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, মোক্ষপ্রাপ্তির সুপ্রশস্ত সোপান, দার্শনিকের অনন্ত তত্ত্বভাণ্ডার, কবির কল্পনা-কল্পতরু। তুমি শান্তিলাভের একমাত্র সুপ্রশস্ত পথ। যাহা হইলে মানবের মনে ক্ষণিক আমোদ, পরে শতগুণ অনুতাপ উদিত হয় না, যাহা হইলে মানবের দুর্দ্দম প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়, যাহা হইলে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ আশা শূন্যসৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া মনে হয়, তাহা তুমি নীরব ভাষালহরীতে ভাবুকহৃদয়-নির্ঝরিণীতে উদিত কর। যে স্থানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, সেই রোগতাপ-বর্জ্জিত শান্তিময় প্রদেশে গমন করিতে হইলে, শ্মশান! অগ্রে তোমার ঐ মহাপুণ্য-ময় ক্রোড়ে একবার শয়ন করিতে হইবে। শ্মশান! তোমার মহানিস্তব্ধতাময়, বিরাট বৈরাগ্যময় ও বিকট বিভীষিকাময় চিত্রের মধ্যে মহাশিক্ষার এবং স্বর্গীয় শান্তির এক কমনীয় মূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজমান।

শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার।

স্বস্ত্যয়ন।

উপক্রমণিকা।

হে মঙ্গলময়! তব এ ভব-ভবন
জীবের মঙ্গল তরে করেছ সৃজন।
কিন্তু হেথা রোগ শোক বিচ্ছেদ মরণ
পাপ তাপ জরা মৃত্যু দুঃখ অগণন
জীবন ঘেরিয়া সদা করে অন্ধকার,
কার সাধ্য তাহা হ'তে পাইবে নিস্তার?
অজ্ঞান ক্ষীণ-বিশ্বাসী না বুঝি কারণ
নিন্দে বিধাতায় আর কাঁদে অনুক্ষণ।
বিশ্বাসী প্রেমিক তব সন্তান সুজন
জানিয়া তোমায় সর্ব্বমঙ্গল-কারণ,
তোমার চরণে সঁপি জীবনের ভার,
আনন্দে তোমার কার্য্য সাধে অনিবার;
আর তব নাম-সুধা করি সদা পান

প্রাণের উল্লাসে করি তব গুণ গান।
বিপদ-ভঞ্জন তুমি সঙ্কট-হরণ,
দুর্গতি-নাশন দুঃখ-শোক-নিবারণ।
প্রাণ-পণে দিলে তব নামের দোহাই,
সর্ব্বজয়ী ভক্ত তব হয় সর্ব্ব ঠাঁই।
তব নামে দুঃখভার লঘু হয়ে যায়;
তব নামে ভবসিন্ধু বৎস-পদ প্রায়;
তব নামে শোক তাপ পাপের আগুন
নিভে যায়, মরি মরি নামের কি গুণ!
ভবব্যাধি যেমন দুরন্ত দুর্নিবার,
তব নাম তেমনি সু-মহৌষধ তার।
নামে অবতীর্ণ হয়ে নাশ ভব-ভয়,
নিরাপদ কর জীবে দিয়া পদাশ্রয়।

(ক্রমশঃ)

নীতি-কণ্ঠহার।

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তদাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ। ১

যাহা কল্যাণ বলিয়া জানিবে, তাহাতেই আপনাকে নিযুক্ত করিবে। কেহ তোমার প্রতি পাপাচরণ করিলে তুমি তাহার প্রতি পাপাচরণ করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদাই সাধু থাকিবে।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতং। ২

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুভাব দ্বারা অসাধু ভাবকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ। ৩

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে। যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মঃ নাসত্যাৎ বিদ্যতে পরং।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে। ৪

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নাই। ইহলোকে মিথ্যার অপেক্ষা তীব্র বস্তু আর নাই।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরো হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ। ৫

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য বলিবেন এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ, শীততাং যাতি বহ্নিঃ,
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥ ৬

সূর্য্য যদি পশ্চিম দিকে উদয় হয়, জলের পদ্ম যদি পর্ব্বতের শিখরে প্রস্ফুটিত হয়, অচল মেরু যদি চলে এবং অগ্নি যদি শীতল হইয়া যায়, তথাপি সজ্জনের বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না।

হিতেঽহিতঞ্চাসুরিকোঽহিতেঽহিতং
পশুর্মনুষ্যো হিতমহিতে হিতে।
কৃতেঽহিতে শশ্বদপি প্রকৃষ্টং
হিতং করোত্যেব স নাম দেবঃ। ৭

অসুরকে হিত করিলে অহিত করে, পশু অহিতের বদলে অহিত করে, মনুষ্য হিতাহিতের বদলে হিত করে; কিন্তু সর্ব্বদা যার পর নাই অহিত করিলেও যিনি হিত করেন, তাঁহার নাম দেবতা।

যদি ক্ষুধার্ত্তোঽন্নমরির্দ্দদীথাঃ
পানীয়মস্মৈ স তৃষাতুরশ্চেৎ।
এবং হি তস্য ব্ধি নিধাস্যসি ত্বং
জ্বলন্তমঙ্গারমহো পুরস্কৃতঃ। ৮

ক্ষুধার্ত্ত শত্রুকে অন্নদান কর, তৃষ্ণার্ত্ত শত্রুকে পানীয় প্রদান কর, তাহা হইলে শত্রুর মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গার পড়িবে এবং তুমি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার পাইবে।

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং। ৯

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল এবং ক্ষুধার্ত্তকে আহার দিবেক।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা,
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ১০

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা কোনও প্রাণীর হিংসা না করা, প্রত্যুত: সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং দৃশ্যতে ফলং। ১১

কৃষক যাদৃশ বীজ বপন করিবে, তাহার ফল তাদৃশ পায়। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির সেইরূপ ভাল বা মন্দ ফল লাভ হয়।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। ১২

বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিবেক, বালকের মুখ হইতেও সুবচন গ্রহণ করিবেক, শত্রু হইতেও সদাচার গ্রহণ করিবেক এবং নীচকুল হইতেও গুণবতী স্ত্রীলোক গ্রহণ করিবেক।

মহর্ষি।

সুধামাখা ব্রহ্মনাম শুনাইয়া জীবে,
পবিত্র ধরমামৃত করাইয়া পান,
মাতাইয়া ভারতের নর নারী সবে,
মহাতীর্থে মহাযোগী করিলা প্রস্থান।
যে বীজ রাম-মোহন করিলা বপন,
সে অঙ্কুরে ভক্তিবারি করিয়া সিঞ্চন
বিশাল আশ্রয় তরু করিলা সৃজন,
শীতল ছায়াতে যার জুড়ায় জীবন।

জগতের নরনারী জরা মৃত্যু শোক
পাসরিল সমুদয় জনমের তরে,
পাইল জীবনে এক নূতন আলোক;
(তাই) ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত আজ ঘরে ঘরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত অমূল্য রতন
তুলিলা ডুবিয়া তার অতল তলায়,
সে অমূল্য নিধি জীবে করি বিতরণ
দেখালে স্বর্গের ছবি আনিয়া ধরায়।

ভারতের ইতিহাসে—অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান,
সুবর্ণ অক্ষরে লিখি ভাবী বংশধর
রাখিবে যতনে,—শুনি গলিবে পাষাণ,
নবীন জীবন পাবে কত নারী নর।
অচল শিখরে বসি স্তিমিতলোচনে
ধ্যানযোগে নিমগন থাকি নিরন্তর,—
লভিলা সাধন ফল—যে ফল সেবনে
সঞ্জীবিত শত শত তৃষিত অন্তর।
শ্মশানে বৈরাগ্য দেব লভিলা যে দিন
বিলাস-বাসনা ভোগে দিলা বিসর্জ্জন,
উপজিল দিব্যজ্ঞান—(কিবা শুভদিন!)
খুলে গেল অন্ধ আঁখি—মোহের বন্ধন।
যাও যাও যাও দেব! যাও দেবলোকে,
আর্য্য ঋষি-পাশে পাতা তব যোগাসন,
বসোগে সেথায় দেব! তব পুণ্যালোকে
আলোকিত হোক আজ অমরভবন।
সুরনর-বরণীয় ধন্য যোগীবর!
যোগানন্দ-রসপানে থাক নিমগন,
অই তব হৃদি মাঝে জাগে যোগেশ্বর—
যোগিজন-চিতহারি মূরতি মোহন!

শ্রীচ—

নূতন সংবাদ।

১। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় চান্‌সেলার লর্ড কর্জন ছাত্রদিগকে বেশ নরম গরম ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। বাইস চান্‌সেলার পেডলার জাপানের সহিত তুলনা করিয়া এদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা তদুপযোগী করিতে বলিয়াছেন। জাপান বড় হইয়াছে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানাদি আয়ত্ত করিয়া, সে মূলসূত্র ছাড়িয়া জাপানের বাহ্য অনুকরণে বিশেষ ফল দর্শিবে না।

২। সিটি কলেজের প্রধান বিজ্ঞানাধ্যাপক বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, দুই দিনের জ্বরে গত ১লা ফেব্রুয়ারী পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ সচ্চরিত্র শিক্ষক ছিলেন। ইনি সময়ে সময়ে বামাবোধিনীতে বৈজ্ঞানিক যে তত্ত্ব দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। জগদীশ্বর ইহাঁর শান্তিবিধান করুন এবং ইহাঁর নিরাশ্রয় পরিবারের আশ্রয় হউন্।

৩। স্বর্গগত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিমতে তাঁহার চারি পুত্র সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতৃভক্তি-পূর্ণ একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ লাহার পুত্র বাবু হৃষিকেশ লাহা রামমোহন লাইব্রেরীর সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। লেডী কর্জন সন্তানগণসহ ১১ই ফেব্রুয়ারি পি ও আরেবিয়া ষ্টিমারে ভারত যাত্রা করিয়াছেন, ৫ই মার্চ্চ এখানে পৌছিবেন।

৬। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে মনান্তর হওয়াতে রাজা অস্কার রাজকার্য্য হস্তান্তরিত করিয়াছেন।